৫. দেওঘরের স্মৃতি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পড়ুয়ারা এই রচনাটি পড়ে লেখকের ভাবনাচিন্তার সাথে একাত্ম হতে পারবে এবং রচনাটির সম্বন্ধে তাদের নিজেদের মতামত আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রকাশ করতে পারবে।

শরৎচন্দ্রকে বলা হয় 'দরদি কথাসাহিত্যিক'। মানুষকে ভালো না বাসলে, তার প্রতি দরদ না থাকলে লেখক হওয়া যায় না। তাই লেখকমাত্রেই 'দরদি'। কিন্তু শরৎচন্দ্র তো কেবল মানুষকে ভালোবাসতেন না, মানুষের পাশাপাশি তিনি পশুপাখিকেও সমান ভালোবাসতেন। এই লেখাটি পড়ে দেখ: দেওঘরে স্বাস্থ্য-ফেরাতে-আসা গরিব ঘরের মেয়েটির প্রতি তাঁর যেমন দরদ, তেমনি দুটি বেনে-বৌ পাখিকে দু'দিন দেখতে না-পেয়ে তিনি উতলা হন, ক'দিনের 'অতিথি' রাস্তার একটি কুকুরকে ফেলে আসতেও তাঁর মনে কত কষ্ট।

চিকিৎসকের আদেশে দেওঘর এসেছিলাম বায়ু পরিবর্তনের জন্য। আসার সময় রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি বারংবার মনে হয়েছিল—

ওষুধ ডাক্তারে—
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো
— করলে যখন অস্থি জরজর
তখন বললে, 'হাওয়া বদল করো'।

বায়ু পরিবর্তনে সাধারণত যা হয় সে-ও লোকে জানে, আবার আসে-ও। আমিও এসেছি। প্রাচীর ঘেরা বাগানের মধ্যে একটা বড়ো বাড়িতে থাকি। রাত্রি তিনটে থেকে কাছে কোথাও একজন গলাভাঙা একঘেয়ে সুরে ভজন শুরু করে, ঘুম ভেঙে যায়, দোর খুলে বারান্দায় এসে বসি। ধীরে ধীরে রাত্রি শেষ হয়ে আসে— পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়। দেখতাম ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভোরে ওঠে দোয়েল। অন্ধকার শেষ হতে-না-হতেই তাদের গান আরম্ভ হয়, তারপর একটি-দুটি করে আসতে থাকে বুলবুলি, শ্যামা, শালিক, টুনটুনি— পাশের বাড়ির আমগাছে, এ-বাড়ির বকুল-কুঞ্জে, পথের ধারের অশ্বত্থ গাছের মাথায়— সলকে চোখে দেখতে পেতাম না, কিন্তু প্রতিদিন ডাক শোনার অভ্যাসে মনে হত যেন ওদের প্রত্যেককেই চিনি। হলদে রঙের একজোড়া বেনে-বৌ পাখি একটু দেরি করে আসত। প্রাচীরের ধারে ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের সব চেয়ে উঁচু ডালটায় বসে তারা প্রত্যহ হাজিরা হেঁকে যেত। হঠাৎ কী জানি কেন দিন-দুই এল না দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম— কেউ ধরলে না তো? এদেশে ব্যাধের অভাব নেই— পাখি চালান দেওয়াই তাদের ব্যাবসা— কিন্তু তিন দিনের দিন আবার দুটিকে ফিরে আসতে দেখে মনে হল যেন সত্যিকার একটা ভাবনা ঘুচে গেল।

এমনি করে সকাল কাটে। বিকালে গেটের বাইরে পথের ধারে এসে বসি। নিজের সামর্থ্য নেই বেড়াবার, যাদের আছে তাদের প্রতি চেয়ে-চেয়ে দেখতাম। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে পীড়িতদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই ঢের

বেশি। সব চেয়ে দুঃখ হত আমার একটি দরিদ্র ঘরের মেয়েকে দেখে। সে একলা যেত। সঙ্গে আত্মীয়স্বজন নেই, শুধু তিনটি ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ে। বয়স বোধকরি চব্বিশ-পঁচিশ, কিন্তু দেহ যেমন শীর্ণ মুখ তেমনি পাণ্ডুর— কোথাও যেন এতটুকু রক্ত নেই। শক্তি নেই নিজের দেহটাকে টানবার, তবু সবচেয়ে ছোটো ছেলেটি তার কোলে। ছেঁড়াখোঁড়া জামা-কাপড়ে সন্তান তিনটিকে ঢেকেঢুকে প্রত্যহই সে এই পথে চলত। হয়তো ভেবেছে, আর কিছুতে যা হল না, সাঁওতাল পরগনার স্বাস্থ্যকর জল হাওয়ায় সেটুকু সে পূরণ করে নিতে পারবে। রোগমুক্ত হয়ে আবার ফিরে পাবে বল, ফিরে পাবে আশা। মনে মনে আশীর্বাদ করতাম— মেয়েটি যেন ভালো হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারে, ছেলে তিনটি যেন ও মানুষ করবার অবকাশ পায়।

আমার সঙ্গে এসেছিল একটি যুবক বন্ধু। নিঃস্বার্থ তার সেবা— কলকাতায় ভারী অসুখের সময়েও যেমন দেখেছি, এখানেও দেখতে পেলাম তেমনি। মাঝে মাঝে সে বলত— 'চলুন দাদা, আজ একটু বেড়িয়ে আসবেন। বেড়ালে খিদে পাড়ে।' আমি বলতাম, 'তুমি যাও ভাই, আমি এখানে বসেই ও-কাজটা সেরে নিই।' সেদিন বন্ধু গেছেন ভ্রমণে। সন্ধ্যার তখনও দেরি আছে। দেখি জনকয়েক বৃদ্ধ ব্যক্তি যথাশক্তি দ্রুতপদেই বাসায় ফিরছেন। তাঁদের চলন দেখে ভরসা হল, ভাবলাম যাই, আমিও একটু ঘুরে আসিগে। সেদিন পথে পথে অনেক বেড়ালাম। অন্ধকার হয়ে এল, ভেবেছিলাম আমি একাকী, হঠাৎ পিছনে চেয়ে দেখি একটি কুকুর আমার পিছনে চলেছে। বললাম, 'কী রে, যাবি আমার সঙ্গে? অন্ধকার পথটায় বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবি?' সে দুরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল। বুঝলাম সে রাজি আছে। বললাম, 'তবে আয় আমার সঙ্গে।' পথের ধারের একটা আলোতে দেখতে পেলাম কুকুরটার বয়স হয়েছে, রোগে পিঠের লোম উঠে গেছে, একটু খুঁড়িয়ে চলে। তাকে অনেক কিছু প্রশ্ন করতে করতে বাড়ির সুমুখে এসে পৌঁছলাম। গেট খুলে দিয়ে ডাকলাম, 'ভেতরে আয়। আজ তুই আমার অতিথি।' সে বাইরে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগল। কিছুতে ভেতরে ঢোকার ভরসা পেলে না। আলো নিয়ে চাকর এসে উপস্থিত হল, গেট বন্ধ করে দিতে চাইলে, বললাম, 'না, খোলাই থাক। যদি আসে ওকে খেতে দিস।' ঘন্টা-খানেক পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম সে আসেনি— কোথায় চলে গেছে।

পরদিন সকালে বাইরে এসেই দেখি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আমার সেই কালকের অতিথি। বললাম, 'কাল তোকে খেতে নেমন্তন্ন করলাম, এলিনে কেন?'

জবাবে সে মুখপানে চেয়ে তেমনি ল্যাজ নাড়তে লাগল। বললাম, 'আজ তুই খেয়ে যাবি— না খেয়ে

যাসনে। বুঝলি?' প্রত্যুত্তরে সে শুধু ঘন ঘন ল্যাজ নাড়লে— অর্থ বোধ হয় এই যে— সত্যি বলছে তো?

রাত্রে চাকর এসে জানালে সেই কুকুরটা এসে আজ বাইরের বারান্দায় নীচে উঠানে বসে আছে। বামুনঠাকুরকে ডেকে বলে দিলাম, 'ও আমার অতিথি, ওকে পেট ভরে খেতে দিও।'

পরের দিন খবর পেলাম অতিথি যায়নি। আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে সে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। বললাম, 'তা হোক, ওকে তোমরা খেতে দিও।'

আমি জানতাম প্রত্যহ খাবার তো অনেক ফেলা যায়, এতে কারও আপত্তি হবে না। কিন্তু আপত্তি ছিল এবং অত্যন্ত গুরুতর আপত্তি। আমাদের বাড়তি খাবারের সে প্রবল অংশীদার ছিল এ বাগানের মালির মালিনী— এ আমি জানতাম না। খাওয়া সম্বন্ধে সে নির্বিকারচিত্ত। অতএব, আমার অতিথি করে উপবাস। বিকালে পথের ধারে গিয়ে বসি, দেখি অতিথি আগে থেকেই বসে আছে ধুলোয়। বেড়াতে বার হলে সে হয় পথের সঙ্গী; জিজ্ঞাসা করি, 'হাঁ অতিথি, আজ মাংস-রান্নাটা কেমন হয়েছিল রে? হাড়গুলো চিবোতে লাগল কেমন?' সে জবাব দেয় ল্যাজ নেড়ে, মনে করি মাংসটা তা হলে ওর ভালোই লেগেছে। জানিনে যে মালির বউ তাকে মেরে ধরে বার করে দিয়েছে,— বাগানের মধ্যে ঢুকতে দেয় না, তাই ও সুমুখের পথের ধারে বসে কাটায়।

হঠাৎ শরীরটা খারাপ হল, দিন-দুই নীচে নামতে পারলাম না। দুপুরবেলা উপরের ঘরে বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজটা সেইমাত্র পড়া হয়ে গেছে। সহসা খোলা দোর দিয়ে সিঁড়ির উপর ছায়া পড়ল কুকুরের। মুখ বাড়িয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে। দুপুরবেলা চাকরেরা সব ঘুমিয়েছে, ঘর তাদের বন্ধ, এই সুযোগে লুকিয়ে সে একেবারে আমার ঘরের সামনে এসে হাজির। ভাবলাম, দুদিন দেখতে পায়নি, তাই বুঝি আমাকে ও দেখতে এসেছে। ডাকলাম, 'আয় অতিথি, ঘরে আয়।' সে এল না, সেখানে দাঁড়িয়েই ল্যাজ নাড়তে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'খাওয়া হয়েছে তো রে? কী খেলি আজ?'

হঠাৎ মনে হল, ওর চোখ দুটো যেন ভিজেভিজে, যেন গোপনে আমার কাছে কী একটা ও নালিশ জানাতে চায়। চাকরদের হাঁক দিলাম, ওদের দোর খোলার শব্দেই অতিথি ছুটে পালাল।

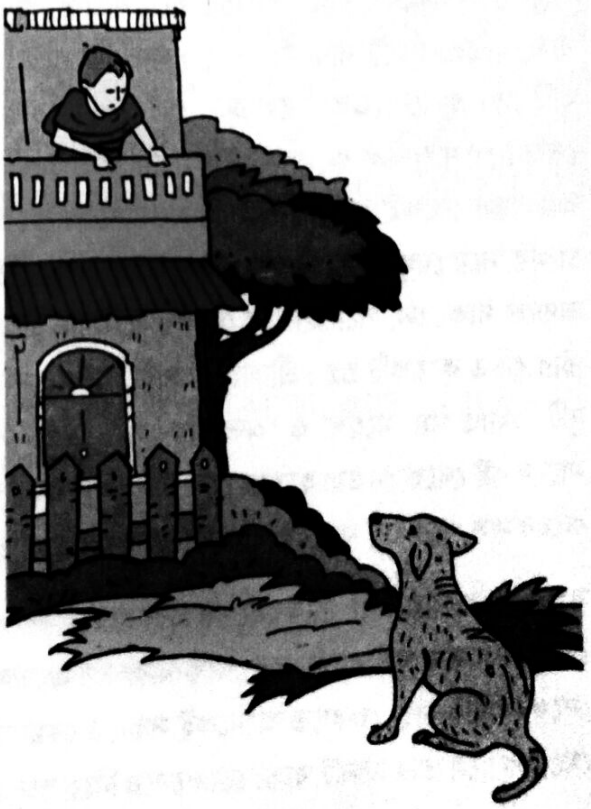

জিজ্ঞাসা করলাম, 'হাঁ রে কুকুরটাকে আজ খেতে দিয়েছিস?'

'আজ্ঞে না। মালি-বৌ ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে যে।'

'আজ তো অনেক খাবার বেঁচেছে, সে সব হল কী?'

'মালি-বৌ চেঁচেপুঁছে নিয়ে গেছে।'

হাঙ্গামা শুনে বন্ধু ঘুম ভেঙে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘরে এল, মুচকি হেসে বলল, 'দাদার এক কাণ্ড! মানুষে খেতে পায় না, পথের কুকুরকে ডেকে খাওয়ানো! বেশ।' বন্ধু জানে, এর চেয়ে অকাট্য যুক্তি আর নেই। মানুষকে না দিয়ে কুকুরকে দেওয়া! শুনে চুপ করে রইলাম।

সে যাই হোক, আবার অতিথিকে ডেকে আনা হল। আবার সে বারান্দার নীচে উঠানের ধুলোয় পরম নিশ্চিন্তে স্থান

করে নিলে।

মালি-বৌয়ের ভয়টা তার গেছে। বেলা যায়, বিকাল হলে উপরের বারান্দা থেকে দেখি, অতিথি এই দিকে চেয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে। বেড়াতে যাবার সময় হল যে।

শরীর সারল না, দেওঘর থেকে বিদায় নেবার দিন এসে পড়ল। তবু দিন-দুই দেরি করলাম নানা ছলে। আজ সকাল থেকে জিনিস বাঁধাবাঁধি শুরু হল— দুপুরের ট্রেন। গেটের বাইরে সার সার গাড়ি এসে দাঁড়াল। মালপত্র বোঝাই দেওয়া চলল। অতিথি মহাব্যস্ত, কুলিদের সঙ্গে ক্রমাগত ছুটোছুটি করে খবরদারি করতে লাগল, কোথাও যেন কিছু খোওয়া না যায়। তার উৎসাহই সব চেয়ে বেশি।

একে একে গাড়িগুলো ছেড়ে দিলে, আমার গাড়িটাও চলতে শুরু করলে। স্টেশন দূরে নয়, সেখানে পৌঁছে নামতে গিয়ে দেখি অতিথি দাঁড়িয়ে— 'কী রে, এখানেও এসেছিস?' সে ল্যাজ নেড়ে তার জবাব দিলে,— কী জানি মানে তার কী!

টিকিট কেনা হল, মালপত্র তোলা হল, বন্ধু এসে খবর দিল— ট্রেন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরি। সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল তারা বকশিশ পেলে সবাই, পেলে না কেবল অতিথি। গরম বাতাসে ধুলো উড়িয়ে সামনেটা আচ্ছন্ন করেছে; যাবার আগে তারই মধ্যে দিয়ে ঝাপসা দেখতে পেলাম— স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথি। ট্রেন ছেড়ে দিলে, বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল, অতিথি আজ ফিরে গিয়ে দেখবে বাড়ির লোহার গেট বন্ধ,— ঢোকবার জো নেই! পথে দাঁড়িয়ে দিন-দুই তার কাটবে, হয়তো নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের কোন ফাঁকে লুকিয়ে উপরে উঠে খুঁজে দেখবে আমার ঘরটা— তার পরে পথের কুকুর পথেই আশ্রয় নেবে।

জেনে রাখো

সংক্ষেপে লেখকের কথা: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর, হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। বাবা, মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। মা, ভুবনমোহিনী দেবী। শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলার অনেকগুলি দিন কেটেছিল ভাগলপুরে মামার বাড়িতে। এখানে জেলা স্কুলে ক্লাস ফোর-এ ভর্তি হয়ে ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়ে অর্থাভাবে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। পরে তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে পড়াশোনা আর এগোয়নি। অল্প বয়স থেকেই সাহিত্য-রচনায় মনোনিবেশ করেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা, গান-বাজনা করতেন। চাকরি নিয়ে রেঙ্গুন গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় চলে আসেন। প্রথমে বাজে-শিবপুর অঞ্চলে থাকতেন, পরে হাওড়া জেলার পানিত্রাস গ্রাম। শেষ জীবনে কলকাতার অশ্বিনী দত্ত রোডে বাড়ি তৈরি করেছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ : শ্রীকান্ত (৪ পর্ব), রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, নিষ্কৃতি, বড়দিদি, দেবদাস, পথের দাবী প্রভৃতি। তাঁর দুটি বিখ্যাত গল্প 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ'। ১৯৩৮ সালের ১৬ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। এই লেখাটি তাঁর ছেলেবেলার গল্প নামের বই থেকে নেওয়া হয়েছে। লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায়। এর কয়েকমাস পরে ওই বছরের মাঘ মাসের ২ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়।

সংক্ষেপে রচনার কথা: চিকিৎসকের পরামর্শে লেখক শরীর সারাতে এসেছেন দেওঘরে। ভাঙাগলায় কার ভজনগান শুনে খুব ভোরবেলা তাঁর ঘুম ভাঙে। ঘর থেকে বারান্দায় এসে বসে তিনি শুনতে পান নানারকম পাখির কাকলি। পথের দিকে তাকিয়ে দেখেন শরীর স্বাস্থ্য ফেরাতে অনেকেই সকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে নজরে পড়ে একটি রুগ্ন গরিব মেয়েকে। সে তার তিনটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে নিয়ে অসুস্থ শরীরে অনে কষ্টে হেঁটে যায়। লেখক মেয়েটির জন্য মনে মনে প্রার্থনা

করেন— এই বায়ু পরিবর্তনের ফলে সে যেন সুস্থ হয়ে ওঠে। একদিন বেড়াতে বেরিয়ে ফেরার সময় একটা লোম-ওঠা খোঁড়া কুকুর লেখকের পিছু নেয়। লেখক তাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরেন। ঠাকুর-চাকরদের বলে দেন কুকুরটাকে খেতে দিতে, কারণ সে লেখকের 'অতিথি'। প্রথম দিন অতিথি খাবার পেলেও পরের দিন থেকে খাবার দেওয়া হত না। অতিথি কিন্তু গেটের বাইরে বসেই থাকত। লেখককে দেখলে লেজ নাড়ত। শরীর খারাপ থাকায় লেখক দুদিন নীচে নামেননি। তিন দিনের দিন হঠাৎ দুপুরবেলা দেখেন কুকুরটা চুপিচুপি দোতলায় সিঁড়িতে উঠে এসেছে। তিনি পরিচারককে ডাকতেই কুকুরটা ছুটে পালিয়ে যায়। তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, অতিথিকে খাবার দেওয়া হয়নি। বাড়তি খাবার মালি-বৌ সব নিয়ে গিয়েছে। সেদিন অতিথিকে ডেকে এনে খাবার দেওয়া হয়েছিল। বিকেলে বেড়াতে যাবার সময় হলেই অতিথি লেখকের সঙ্গে যাবার জন্য তৈরি হত।

শরীর না সারায় লেখক ফিরে যাবেন ঠিক করলেন। কিন্তু কুকুরটির টানে আরও দুদিন থেকে গেলেন। যাবার দিন জিনিসপত্র গাড়িতে তোলার সময় অতিথিও খুব ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে। গাড়ির সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত যায়। কাজের লোকেরা সবাই লেখকের কাছ থেকে বকশিশ পায় এক অতিথি ছাড়া। সে স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে লেখকের দিকে চেয়ে থাকে। অতিথিকে একা ফেলে রেখে বাড়ি ফিরে যেতে লেখকের একেবারেই ইচ্ছে করছিল না।

শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ

বায়ু পরিবর্তন—স্বাস্থ্যলাভের জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বেড়াতে যাওয়া

গলাভাঙা—ভাঙাগলায়

ভজন—দেবতার স্তবগান

বকুল-কুঞ্জ—বকুল গাছের বন। কুঞ্জ=লতায় ঘেরা জায়গা, উপবন

ইউক্যালিপ্টাস—eucalyptus। সরু ও লম্বা পাতাওয়ালা এক রকমের অস্ট্রেলীয় চিরহরিৎ গাছ

প্রত্যহ—রোজ রোজ, প্রতিদিন। প্রতি + অহ। বিশেষ্য। বিশেষণ—প্রাত্যহিক। অব্যয়ীভাব সমাস

হাজিরা হাঁকা—হাজির বা উপস্থিত আছি, এই কথা ঘোষণা করা

ব্যাধ—শিকারি। স্ত্রীলিঙ্গ—ব্যাধিনী

ঘুচে গেল—দূর হল

পাণ্ডুর—ফ্যাকাশে

আশীর্বাদ—গুরুজনের আশিস, শুভেচ্ছা। মঙ্গলকামনা, কল্যাণকামনা

নিঃস্বার্থ—স্বার্থহীন, স্বার্থশূন্য। নিজের লাভের কথা ভাবে না এমন, নিজের প্রয়োজন বা উপকারের জন্য নয় এমন। বিপরীত—স্বার্থ

নির্বিকারচিত্ত—মনে কোনো বিকার বা চাঞ্চল্য নেই

জো—উপায়, সুযোগ

নিস্তব্ধ—নীরব। বিশেষণ। বিশেষ্য—নিস্তব্ধতা

মধ্যাহ্ন—দুপুর, দিনের মধ্যভাগ। মধ্য + অহ্ন। অহ্ন = দিন। বানান দেখে রাখ : মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন (হ-এ দন্ত্য 'ন') কিন্তু অপরাহ্ণ, পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ (হ-এ মূর্ধন্য 'ণ')

ব্যাখ্যা

১. আসার সময়ে রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি বারংবার মনে হয়েছিল—

এখানে রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' কাব্যের 'ফাঁকি' কবিতাটির কথা বলা হয়েছে। অনেক বড়ো কবিতা। শুরুটা এইরকম:

বিনুর বয়স তেইশ যখন, রোগে ধরল তারে।
ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো,
নানা মাপের জমল শিশি, নানা মাপের কৌটো হল জড়ো।
বছর দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থির জরজর
তখন বলে, 'হাওয়া বদল করো'।

২. এদেশে ব্যাধের অভাব নেই— পাখি চালান দেওয়াই তাদের ব্যাবসা—
আমাদের দেশে পাখি শিকার করা কোনো কোনো মানুষের পেশা। কেউ তার মাংস খায়, কেউ বিক্রি করে। সময়মতো বেনে-বৌ পাখি দুটিকে আসতে না-দেখে লেখকের মনে আশঙ্কা জাগে— ওরা বোধ হয় কোনো শিকারির ফাঁদে ধরা পড়েছে তাই আসতে পারেনি। পাখি দুটি যখন ফিরে আসে তখন লেখকও নিশ্চিন্ত হন। এই অংশে লেখকের দরদি মনের পরিচয় পাই।

জেনে রাখো: পাখি ধরা, পাখি পোষা, পাখি শিকার করা নিষেধ। নিজেরা তো কখনো এ-কাজ করবেই না, অন্য কাউকে করতে দেখলেও বাধা দেবে।

৩. হয়তো ভেবেছে, আর কিছুতে যা হল না, সাঁওতাল পরগনার স্বাস্থ্যকর জল হাওয়ায় সেটুকু সে পূরণ করে নিতে পারবে।
রুগ্ন মেয়েটি গরিব ঘরের। দামি ওষুধপথ্য কিনে ভালোমতো রোগের চিকিৎসা করার ক্ষমতা তার নেই। তবু, হয়তো, সাধ্যমতো চিকিৎসা সে করিয়েছে। কিন্তু শরীর সারেনি। নিরুপায় হয়ে তাই এখানে সে রোগ সারাবার ভারটা ছেড়ে দিয়েছে দেওঘরের বিনে-পয়সার স্বাস্থ্যকর জল-হাওয়ার ওপর। ভাগ্য যদি ভালো থাকে, রোগ এতেই সারবে। লেখকের দরদি মনের পাশাপাশি এদেশের গরিব মানুষদের অসহায়তার কথা এই অংশে ফুটে উঠেছে।

৪. মনে মনে আশীর্বাদ করতাম— মেয়েটি যেন ভালো হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারে,
গরিব রুগ্ন মেয়েটির প্রতি লেখকের মমতা এখানে প্রকাশ পাচ্ছে। অনেক পয়সা খরচ করে, চিকিৎসা করিয়ে রোগ ভালো করার সাধ্য তার নেই। কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা তার প্রবল। তাই রুগ্ন শরীর নিয়েও সে ছোটো ছেলেটিকে কোলে নিয়ে অনেক কষ্টে প্রাতর্ভ্রমণ করে। লেখকও চান, মেয়েটি ভালো হয়ে উঠুক। তাই তিনি মনে মনে মেয়েটির কল্যাণকামনা করছেন: সে আবার সুস্থ হয়ে উঠুক, ঘর-সংসার করুক, অন্তত ছেলে-মেয়েদের মানুষ করা অবধি বেঁচে থাকুক।

৫. আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে সে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে।
অতিথিকে ডেকে আনা হয়েছে। খেতেও দেওয়া হয়েছে। এর পর অতিথির উচিত চলে যাওয়া। কিন্তু এই অতিথি তা করেনি। সে যায়নি। তাই লেখক একটু মজা করেই বলছেন, কুকুরটা তাঁর আতিথেয়তার মর্যাদা দিল না। শিষ্টতার অভাব সত্ত্বেও লেখক অবশ্য অতিথিকে ক্ষমা করে দিলেন।

৬. দাদার এক কাণ্ড! মানুষ খেতে পায় না, পথের কুকুরকে ডেকে খাওয়ানো!
বেশির ভাগ মানুষ লেখকের বন্ধুর এই কথার সঙ্গে একমত হবেন। ঠিকই তো, মানুষকে ফেলে কুকুরকে খাবার দেওয়ার কোনো মানে হয়? কিন্তু এ সংসারে কার সঙ্গে কখন যে কার মমতার সম্পর্ক গড়ে উঠবে তা আগে থাকতে বোঝা যায় না। এখানেও লেখকের সঙ্গে পথের কুকুরটির যে মমতার বন্ধন গড়ে উঠেছে তাতে মানুষ ও কুকুরের ব্যবধান মুছে গেছে। তাছাড়া লেখক তো বাড়তি খাবার থেকেই কুকুরকে দিতে বলেছেন। বন্ধুটি নিঃস্বার্থ এবং পরোপকারী হলেও লেখকের মনের এই ভাবটুকু বুঝে উঠতে পারেননি।

৭. তবু দিন-দুই দেরি করলাম নানা ছলে।
কুকুরটির প্রতি লেখকের গভীর মমতা জন্মেছে, তাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। তাই নানা অজুহাতে আরও দুদিন বেশি থেকে গেলেন। লেখকের মমতাময় মনটি লক্ষ করো।

৮. ট্রেন ছেড়ে দিল, বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেলাম না।
অতিথি পথের কুকুর। লেখক ছাড়া এখানে কেউ নেই তাকে ভালোবাসবার। তিনি চলে গেলে সে বাড়িতে ঢুকতে পারবে না, খাবার পাওয়া তো দূরের কথা। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে। হয়তো কখনো চুপি চুপি ওপরে উঠে লেখককে খুঁজবে। তারপর পথের কুকুর পথেই ফিরে যাবে। অনাদৃত, অবহেলিত কুকুরটির কথা ভেবেই লেখক বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন।

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বল:

ক) 'দেওঘরের স্মৃতি' কার লেখা?

খ) আসার সময় কার, কোন কবিতাটি লেখকের মনে পড়েছিল?

গ) সকালবেলা কোন কোন পাখি আসত?

ঘ) ব্যাধের কাজ কী?

ঙ) সাঁওতাল পরগনার জলহাওয়া কেমন?

চ) অতিথি'র চেহারাটি কেমন ছিল?

ছ) দিনের বাড়তি খাবার কে নিয়ে যেত?

জ) দেওঘর থেকে লেখক চলে এলেন কেন?

ঝ) অতিথি আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছিল কীভাবে?

ঞ) দেওঘরের পুরানো নাম কী?

২. এককথায় উত্তর দাও: কোনটা ঠিক? তার পাশে ✓ চিহ্ন দিয়ে দেখাও

ক) কে লেখকের ঘুম ভাঙত?	গায়ক / পাখির ডাক
খ) পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে ভোরে ওঠে কে?	শালিক / দোয়েল
গ) একটু দেরি করে কোন পাখিরা আসত?	বেনে-বৌ / টুনটুনি
ঘ) রুগ্ন মেয়েটির কোলে কে থাকত?	ছোটো ছেলে / কেউ থাকত না
ঙ) পীড়িতদের মধ্যে কাদের সংখ্যা বেশি থাকত?	পুরুষ / নারী
চ) লেখকের বন্ধু কেমন ছিলেন?	নিঃস্বার্থ / স্বার্থপর

ছোটো প্রশ্ন : সংক্ষেপে উত্তর দাও

ক) '...প্রতিদিন ডাক শোনার অভ্যাসে মনে হত যেন ওদের প্রত্যেককেই চিনি।'— এই উক্তি কার? কাদের ডাক? তারা কে কোথায় বসে ডাকত? 'প্রত্যেককে' মানে কাকে কাকে?

খ) '...যেন সত্যিকার একটা ভাবনা ঘুচে গেল।'—কাদের নিয়ে ভাবনা? কীসের ভাবনা? 'ভাবনা ঘুচে গেল' কী করে?

গ) 'আজ তুই আমার অতিথি।'—বক্তা কে? 'অতিথি' কাকে বলা হচ্ছে? তাকে দেখতে কেমন? তাকে কোথায় কীভাবে লেখক পেলেন?

ঘ) 'তার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি।'—কার? কোন আচরণ থেকে এই 'উৎসাহ' বোঝা গেল?

বড়ো প্রশ্ন : পাঠ্যাংশের সাহায্য নিয়ে নিজের ভাষায় উত্তর লেখো

ক) 'দেওঘরের স্মৃতি' রচনায় মানুষ-পশু-পাখির প্রতি লেখকের মমতা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে গুছিয়ে লেখো।

খ) 'দেওঘরের স্মৃতি' রচনাটিতে লেখকের দরদি মনের পরিচয় কোথায় কতখানি ফুটে উঠেছে বুঝিয়ে লেখো।

গ) দেওঘরে লেখকের দিন-রাত কাদের নিয়ে কীভাবে কাটত বর্ণনা করো।

ঘ) প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে লেখকের যাবার দিন পর্যন্ত ঘটনা অবলম্বন করে 'অতিথি'কে নিয়ে একটি রচনা লেখো।

ব্যাকরণ

১. বাক্যরচনা করো

জনাকয়েক মেরেধরে ভিজেভিজে চেঁচেপুঁছে ছুটোছুটি মালপত্র আনাগোনা

২. সন্ধিবিচ্ছেদ করো

প্রত্যহ মধ্যাহ্ন প্রত্যুত্তর ক্রমাগত

৩. কোনটা কী পদ পাশে লিখে পদ-পরিবর্তন করো

প্রত্যহ দারিদ্র্য জল ক্ষুধা পীড়িত স্বাস্থ্যকর

৪. বাক্যে ঠিকমতো প্রয়োগ করে দেখাও

ঢাকবার জো নেই হাজিরা হেঁকে যাওয়া ভাবনা ঘুচে যাওয়া

কুকুরটির প্রতি মালির বউয়ের আচরণ কি তোমার উচিত বলে মনে হয়েছে? তুমি মালির বউয়ের জায়গায় হলে কী করতে?

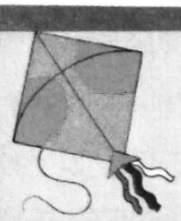

কোনো নতুন জায়গায় বেড়াতে গিয়ে কারও সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে তোমার। সেই অভিজ্ঞতার কথা গুছিয়ে লেখো।

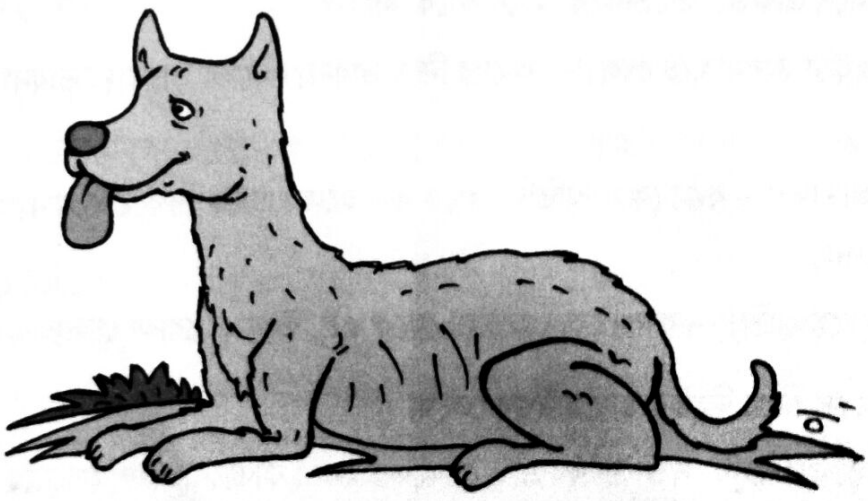

৮. জন্মভূমি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপা

কবিতাটি পড়ে ছাত্রছাত্রীরা তার মূল বিষয়বস্তু বুঝে ভাবসম্প্রসারণ করতে পারবে। তারা তাদের লেখনীতে ব্যাকরণসম্মত ভাষা ব্যবহার করে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।

এই আমার, জগতের সার,
স্মৃতির সুখকর জনম-ঠাঁই।
যেখানে আহ্লাদে নবীন আস্বাদে,
শৈশব-জীবন সুখে কাটাই।

যে সুখের দিন আজও পড়ে মনে,
ভুলিব না যাহা কভু এ জীবনে,
যেখানেই থাকি যেথা-ই যাই
হেরেছি কতই নগরী নগর,
কত রাজধানী অপূর্ব সুন্দর,
এ শোভা ঐশ্বর্য কোথাও নাই।

গৃহ ঘাট মাঠ তরু জলাশয়
স্মৃতি-পরিমল-মাখা সমুদয়,
হেন স্থান আর কোথায় আছে,
জগতে জননী জনম-ভুবন,
গুরুত্ব গৌরবে দুই অতুলন,
স্বরগও নিকৃষ্ট দুয়েরই কাছে।

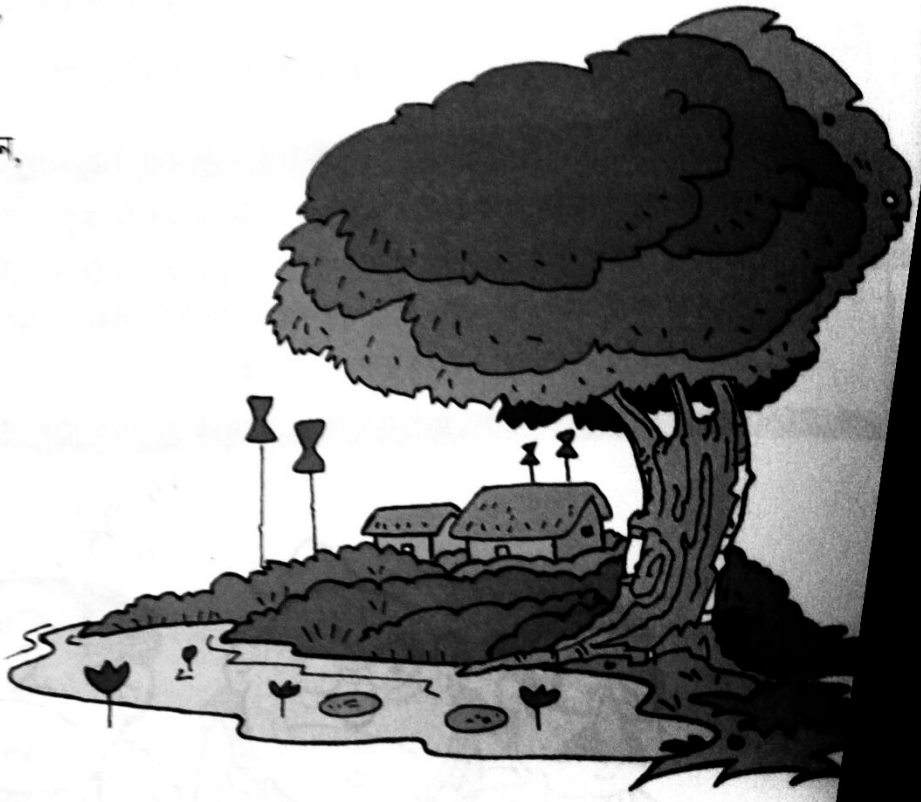

এই কবিতাটি পড়ানোর শেষে পড়ুয়াদের সাথে আলোচনা করুন যে তারা কি কবির সাথে একমত?

জেনে রাখো

সংক্ষেপে কবির কথা: হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ এপ্রিল, হুগলি জেলার গুলিটা গ্রামে। বাবা, কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের পাঠশালায়। পরে কলকাতায় এসে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হলে সেখান থেকে বি.এ. পাশ করেন। হেমচন্দ্রের প্রধান পরিচয়, তিনি একজন দেশপ্রেমিক যশস্বী কবি। দেশের জন্য আত্মত্যাগকেই তিনি পরাধীন ভারতের মুক্তিলাভের পথ বলে মনে করতেন। পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত বৃত্রসংহার কাব্য তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা। ভারতবিলাপ, কালচক্র, বীরবাহুকাব্য, ভারতের নিদ্রাভঙ্গ প্রভৃতি রচনাতেও তাঁর স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। শেষ জীবনে কবি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ মে তাঁর মৃত্যু হয়। এই কবিতাটি কলকাতার ৩০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতা পুরসভা কর্তৃক প্রকাশিত খুশির খেয়া নামের সংকলন থেকে গৃহীত।

সংক্ষেপে কবিতার কথা: শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত জন্মভূমির কথা কবি কখনো ভুলতে পারেননি। কবি বলছেন : জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান তাঁর জন্মভূমি যেখানে তিনি তাঁর শিশুকাল সুখেই কাটিয়েছেন। বড়ো হয়েও সে-সব দিনের কথা তাঁর মনে পড়ছে। কবি নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। সুন্দর সুন্দর কত নগর, কত রাজধানী দেখেছেন কিন্তু জন্মভূমির শোভার সঙ্গে তাদের কারও তুলনা হয় না। এখানকার ঘরবাড়ি, মাঠঘাট, গাছপালা, পুকুর, খালবিল— সব কিছুর সঙ্গে মিশে আছে তাঁর শৈশবের স্মৃতি। এরকম জায়গা আর কোথাও নেই। এ সংসারে জননী ও জন্মভূমি দুয়েরই গুরুত্ব ও গৌরব অপরিসীম। এই দুয়ের কাছে স্বর্গও তুচ্ছ।

শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ

সার—শ্রেষ্ঠ। বিপরীত—অসার। এই শব্দের অন্য কয়েকটি প্রয়োগ দেখে রাখো : গল্পের সংক্ষিপ্তসার। কঙ্কালসার চেহারা। কেবল কথাই সার, কাজে অষ্টরম্ভা। তাগাদা দেওয়াই সার, পেলাম না কিছুই। জমিতে সার দিলে ফসল ভালো হয়।

স্মৃতি—অতীতের কোনো বিষয় মনে করা। বিশেষ্য। বিশেষণ—স্মার্ত, স্মৃত। বিপরীত—বিস্মৃতি

সুখকর—সুখদায়ক। বিপরীত—অসুখকর

ঠাঁই—স্থান

আহ্লাদ—আনন্দ, হর্ষ

নবীন—নতুন

আস্বাদ—স্বাদ, রসগ্রহণ। বিশেষ্য। বিশেষণ—আস্বাদক, আস্বাদিত

ঐশ্বর্য—সম্পদ, ধনসম্পত্তি। বিশেষ্য। বিশেষণ — ঐশ্বর্যবান, ঐশ্বর্যশালী

জলাশয়—পুকুর, খালবিল ইত্যাদি। জল + আশায়। সম্বন্ধ তৎপুরুষ

পরিমল—সুগন্ধ

ভুবন—পৃথিবী, জগৎ। এখানে জনম-ভুবন অর্থ জন্মস্থান, জন্মভূমি

গৌরব—মহিমা, মর্যাদা। বিপরীত—অগৌরব

অতুলন—যার তুলনা নেই, অনুপম। বিশেষণ। বিশেষ্য — অতুলনতা। নঞ বহুব্রীহি

নিকৃষ্ট—খারাপ। বিশেষণ। বিশেষ্য—নিকৃষ্টতা। বিপরীত — উৎকৃষ্ট

কেবল কবিতায় ব্যবহৃত হয়: **জনম**—জন্ম **কভু**—কখনো **হেরেছি**—দেখেছি **হেন**—এমন **স্বরগ**—স্বর্গ

ব্যাখ্যা

১. এই আমার, জগতের সার
স্মৃতির সুখকর জনম ঠাঁই।

জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান কবির এই জন্মভূমি, যেখানে জড়িয়ে আছে তাঁর নানান সুখের স্মৃতি। শৈশবকালে যখন সবকিছুর অর্থ বুঝতে লাগে সেই শৈশবেই কবি মনের আনন্দে তাঁর জন্মভূমিতে জীবন কাটিয়েছেন।

(বয়স বাড়লে মানুষ যুক্তি দিয়ে সবকিছু গ্রহণ করে বা বর্জন করে। তার ভালো-মন্দ মন্দ-ভালোর মানদণ্ডটি ঠিক হয়। কিন্তু শিশুর চোখে সবই নতুন, সবই সুন্দর। বাছবিচার না করে সে সবকিছুর আনন্দ গ্রহণ করে।)

২. সুখ স্মৃতি মাঠ ভরা জলাশয়
স্মৃতি-পরিমল-মাখা-সবুজ,

শৈশবজীবন পার হয়ে কবি অনেকদূর এগিয়ে এসেছেন। কত শহর, কত রাজধানী তিনি দেখেছেন। কিন্তু কোনো কিছুই তাঁর মনে ধরেনি। কী করে ধরবে। তাঁর মনের মণিকোঠায় যে ঝাঁপিটি রয়েছে তাতে যে ভরা রয়েছে তাঁর ছেলে-বেলার ফেলে আসা নানান স্মৃতি — ঘরবাড়ি, পথঘাট, গাছপালা, পুকুর-খালবিল। ফুলে যেমন গন্ধ থাকে, কবির ওইসব স্মৃতিতেও তেমনি জড়িয়ে আছে অতীত দিনের সৌরভ। তাতেই মুগ্ধ হয়ে কবি মজে আছেন।

৩. জগতে জননী জনম-ভূবন,
গুরুত্ব গৌরবে দুই অতুলন,
স্বরগও নিকৃষ্ট, দুয়েরই কাছে।

কথায় বলে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। অর্থাৎ মা এবং জন্মভূমি স্বর্গের চাইতেও বড়ো। স্বর্গ শব্দের অর্থ হল, যেখানে দেবতারা থাকেন, অমরাবতী— যেখানে চিরবসন্ত বিরাজ করে, যেখানে সবাই অমর, কোনো দুঃখ নেই কেবল আনন্দ। অর্থাৎ মানে, স্বর্গ হল চিরসুখময় স্থান। কবি বলছেন, স্বর্গের মতো এমন চিরসুখের স্থানও জননী ও জন্মভূমির কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। জননী অর্থাৎ যাঁর জন্য আমরা প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছি এবং জন্মভূমি অর্থাৎ যেখানে ভূমিষ্ঠ হয়ে এই আলো দেখেছি, তাঁদের মহিমা ও গৌরব কাল্পনিক অমরাবতীর চাইতে অনেক বেশি।

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বলো:

ক) 'জন্মভূমি' কবিতাটি কার রচনা?

খ) জন্মভূমির সঙ্গে কবি কার তুলনা করেছেন?

গ) স্বর্গ বলতে কী বোঝায়?

ঘ) কবিতাটি মুখস্থ বলো।

২. ছোটো প্রশ্ন : সংক্ষেপে উত্তর দাও

ক) 'যে সুখের দিন আজও পড়ে মনে',— কোন সুখের দিন? কেন মনে পড়ে?

খ) 'এ শোভা ঐশ্বর্য কোথাও নাই।'—কোন শোভা? কোথায় কোথায় নেই?

গ) 'স্বরগও নিকৃষ্ট দুয়েরই কাছে।'—'স্বরগ' কী? কোন 'দুইয়ের' কাছে 'নিকৃষ্ট'?

৩. বড়ো প্রশ্ন : পাঠ্যাংশের সাহায্য নিয়ে নিজের ভাষায় উত্তর লেখো

ক) 'জন্মভূমি' কবিতায় জন্মভূমির প্রতি কবির যে গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে তা নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখো।

খ) জন্মভূমিকে ঘিরে কবির শৈশবস্মৃতি কীভাবে কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে বুঝিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ

১. অর্থের পার্থক্য বজায় রেখে বাক্যরচনা কর

স্মৃতি—স্মৃতিকথা যেখানে—যেখানে সেখানে দিন—দিনরাত আজ—আজকাল মনে—আনমনে নগর—নগরপাল

২. কোনটি কী পদ পাশে লিখে পদ-পরিবর্তন করো : জগৎ স্মৃতি আস্বাদ ঐশ্বর্য সুন্দর

৩. নির্দেশ অনুযায়ী উত্তর লেখো

জলাশয় সন্ধিবিচ্ছেদ করো।

কোন সমাস?

গৌরব বিপরীতার্থক শব্দ লেখো।

স্বরগ গদ্যরূপ কী?

বিশেষণ কী?

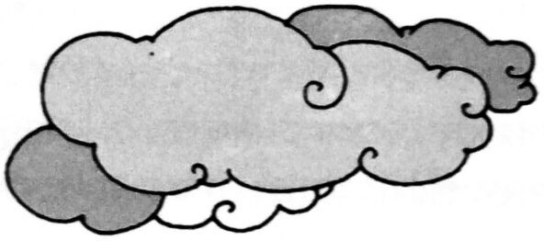

৯. নীলবিদ্রোহ

মুনতাসীর

ছাত্রছাত্রীরা নীলচাষের ইতিহাসের ব্যাপারে জানতে পারবে এবং তার সম্বন্ধে আরও তথ্য খুঁজে পেশ করতে পারবে। এই রচনাটি সম্বন্ধে তারা নিজের মতামত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারবে।

পরাধীন ভারতে বিদেশি শাসকরা নানাভাবে প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাত। কখনো কখনো সেই অত্যাচার প্রজারা সহ্য করতে পারত না। নীলচাষিদের উপর নীলকর সাহেবদের নির্মম নির্যাতন এইরকম একটি উদাহরণ। কিন্তু অত্যাচার যখন চাষিদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন তারা একজোট হয়ে প্রতিবাদ করল এবং জয়ী হল। এ-দেশে নীলচাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। নীলবিদ্রোহ আমাদের ইতিহাসে একটি বড়ো ঘটনা।

কাপড় পরিষ্কার করার জন্য তোমাদের বাসায় মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই নীল আনা হয়। নীল এখন আসে বিদেশ থেকে। কিন্তু তোমরা কি জানো, একসময় আমাদের এই বাংলা দেশে নীল তৈরি করা হত এবং সে নীল বিদেশে বিক্রি করে ইংরেজরা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করত। শুধু তাই নয়, তোমরা শুনে হয়তো অবাক হবে যে বাংলা দেশের নীল ছিল পৃথিবীর সেরা।

নীল গাছ দেখতে অনেকটা পাটগাছের মতো। লম্বায় চার-পাঁচ ফুটের বেশি হত না। নীল গাছ কাটার পর পাটের মতোই জলে ডুবিয়ে পচানো হত। তারপর জ্বাল দেওয়া হত। সবশেষে যে নির্বাসটুকু পড়ে থাকত তাই ছিল নীল। আর নীল জ্বাল দেবার জন্য দরকার ছিল পরিষ্কার জলের। সে জন্য বাংলাদেশের বেশির ভাগ নীল কারখানাই গড়ে উঠেছিল নদীর তীরে।

হুগলির এক গ্রামে, লুই বোনাদ নামে এক ফরাসি বণিক ১৭৭২ সালে এদেশে প্রথম নীলচাষ শুরু করেন। তারপর ইংরেজরা। দেখা গেল নীলচাষ খুব লাভজনক। কয়েক বছরের মধ্যে মেদিনীপুর, বীরভূম, যশোর, পাবনা, ফরিদপুর, নদিয়া, খুলনা, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় নীলচাষ শুরু হল। এই ধরো, মাত্র একশো পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে আমাদের দেশে প্রায় পাঁচশো নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল।

ইংরেজরা আমাদের দেশে দুভাবে নীলচাষ করত। একটির নাম ছিল আবাদি। এ নিয়মে নীলকর, যে নীল কারখানার মালিক সে নিজের জমিতে চাষ করাতো নিজের খরচায়। যে-সব পুরুষ কাজ করত এ-নিয়মে তারা মাসে বেতন পেত তিন টাকা। আর একটি নিয়ম ছিল রায়তি। এ নিয়মে চাষি নিজের জমিতে চাষ করত। কিন্তু তার আগে নীলকরের সঙ্গে একটা চুক্তি করতে হত। নীলকর নীলের দাম হিসেবে আগাম কিছু টাকা দিয়ে দিত চাষিকে। আর এ নিয়েই শুরু হল সংঘাত।

নীলকরেরা বেশি লাভের জন্য নীলচাষিদের ওপর ভয়ানক অত্যাচার করত। মেরেও ফেলত অনেককে। কোনো চাষি কথা না শুনলে গ্রামে বাস করা তার পক্ষে কঠিন হত। ইংরেজ নীলকররা কেন এমন করত? এর কারণ, বেশি লাভ। নীল যত বেশি তৈরি হবে তত বেশি সে বিদেশে পাঠাতে পারবে। সে জন্য যাতে বেশি লোক নীলচাষ করে তাই সে চেষ্টা করত। আর নীল তৈরিতে তার খরচ যত কম হবে তার লাভ হবে তত বেশি। এ জন্য সে নানাভাবে চাষিদের ঠকাত। অনেক সময় চাষিরা আদালতে যেত বিচার চাইতে। কিন্তু ইংরেজ বিচারক ইংরেজ নীলকরের পক্ষে রায় দিতেন। ফলে, একসময় চাষিরা দেখল একজোট হয়ে যদি তারা না দাঁড়ায় তাহলে এই নীলচাষ বন্ধ করা যাবে না। আর তাদের খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা হবে না। অবশেষে ১৮৫৯-৬০ সালে বিদ্রোহ করল নীলচাষিরা। প্রায় ষাট লক্ষ নীলচাষি বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। এর জন্য যে আগে থেকে কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তা কিন্তু নয়। এক জায়গায় শুরু হয়েছিল বিদ্রোহ, তারপর তা ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। অনেক সাংবাদিক, লেখকও এগিয়ে এসেছিলেন নীলচাষিদের সমর্থন করে। দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন বিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণ'। আর তা ১৮৬০ সালে ছাপা হয়েছিল ঢাকা থেকে।

নীলচাষিরা ঠিক করল, আর নীল বুনবে না। নীলকররা নীল বুনতে বাধ্য করতে চাইলে তারা বাধা দিতে লাগল। বিভিন্ন জায়গায় শুরু হল সংঘর্ষ। ইংরেজ সরকার দেখল, এ বিদ্রোহ তো দমন করা যাবে না। চাষিদের শান্ত করার জন্য তাই সরকার ১৮৬০ সালে 'নীল কমিশন' সৃষ্টি করল।

এই কমিশন তার রিপোর্টে স্বীকার করল, চাষিদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে, তাদের ন্যায্য পাওনা দেওয়া হয়নি কিন্তু নীলচাষ বন্ধ করার কোনো পরামর্শ দিল না কমিশন। চাষিরা অবশ্য নিজে থেকেই নীলচাষ বন্ধ করে দিল। এবং এক সময় সারা বাংলাতেই নীলচাষ বন্ধ হয়ে গেল। নীলচাষিরা দেখল, একজোট হয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে শোষক বা অত্যাচারীরা থমকে যেতে বাধ্য।

এখনও অনেক গ্রামে গেলে তোমরা ভাঙা নীলকুঠি দেখতে পাবে। পুরানো দিনের ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারের সাক্ষী হিসেবে এগুলি এখনও দাঁড়িয়ে আছে। কুষ্টিয়ার শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে বিখ্যাত কুঠিবাড়িটি আছে, সেটিও ছিল নীলকুঠি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা এটি কিনেছিলেন নীলকরের কাছ থেকে।

জেনে রাখো

সংক্ষেপে লেখকের কথা: মুনতাসীর মামুন। জন্ম ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে, বাংলাদেশে। বাবা মিসবাহউদ্দিন খান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম.এ. পাশ করেন ১৯৭২ সালে। পেশা অধ্যাপনা। কেদারনাথ মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষের পরে মুনতাসীর মামুন সংবাদ সাময়িকপত্রে সমাজেতিহাস বিষয়ে গবেষণা ও সম্পাদনা করেন। পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র সমাজেতিহাসচর্চার উল্লেখযোগ্য গবেষণা। পুরানো ঢাকা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। 'ঢাকা নগরচর্চা কেন্দ্র' থেকে প্রকাশিত ঢাকা গ্রন্থমালার গ্রন্থমালা-সম্পাদক। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী, ঢাকা-র সম্মানে সম্মানিত। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় অনেক গ্রন্থের রচয়িতা। কিশোর সাহিত্য চর্চা করেন। ভালোবাসেন বই পড়তে ও বই

ব্যাখ্যা

১. অবশেষে ১৯৫৯-৬০ সালে বিদ্রোহ করল নীলচাষিরা।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইয়োরোপীয়দের ভারতে বাণিজ্য করার অনুমতি দিতেই নীলবণিকদের কাছে তা স্বর্ণরাজ্য হয়ে দেখা দিল। বাংলা বিহারে আধিপত্য ছড়ালো নীলকররা। কম খরচে বেশি নীল উৎপাদন করে, মুনাফার পাহাড় গড়তে তারা মরিয়া হয়ে উঠল। বঞ্চনা ও অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেলে নীলচাষিরা বিদ্রোহ করে। প্রায় ৬০ লক্ষ নীলশ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এটা প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট।

২. অনেক সাংবাদিক, লেখকও এগিয়ে এসেছিলেন নীলচাষিদের সমর্থন করে।

দেশের মানুষ নীলচাষিদের বিদ্রোহ সমর্থন করেছিলেন। সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের কথা নিয়মিত প্রকাশ করতেন। তিনি নিল কমিশনে নীলচাষিদের সমর্থনে নীলকরদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। নীলকরদের ভয়াবহ অত্যাচারকে বিষয় করে 'নীলদর্পণ' নাটক লিখলেন দীনবন্ধু মিত্র। ইংরেজিতে অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন। এই অনুবাদ প্রকাশের অপরাধে পাদরি লঙ-কে ইংরেজ সরকারের কাছে জরিমানাও দিতে হয়েছিল। জরিমানার টাকা দিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাঁর মামলার সকল খরচ বহন করেছিলেন পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ। এছাড়াও গণ্যমান্য অনেকেই নীলচাষিদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

৩. ...একজোট হতে অত্যাচারে বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে শোষক ও অত্যাচারীরা থমকে যেতে বাধ্য।

একা লড়াই করে অন্যায়ের প্রতিকার করা কঠিন। কথায় বলে, একতাই বল। আমরা যদি একতাবদ্ধ হয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি তাহলে অত্যাচারী যত শক্তিশালীই হোক না কেন, সে পিছু হঠতে বাধ্য হবে। একতার শক্তি যে কত বড়ো নীলচাষিরা তা প্রমাণ করেছিলেন।

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বলো:

ক) 'নীল বিদ্রোহ' রচনাটি কার লেখা?

খ) বাংলাদেশের কোথায় কোথায় নীলের চাষ হত?

গ) পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় নীলচাষ হত?

ঘ) এদেশে প্রথম নীলচাষ কে করেছিলেন?

ঙ) নীল বিদ্রোহ কবে হয়েছিল?

চ) 'নীলদর্পন' নাটকের নাট্যকার কে?

ছ) 'নীল কমিশন' কবে গঠিত হয়েছিল?

জ) শিলাইদহের কুঠিবাড়ি কে কিনেছিলেন?

২. এককথায় উত্তর দাও

ক) নীল কোথায় বিক্রি হত?

খ) নীলগাছ দেখতে কোন গাছের মতো?

গ) বেশির ভাগ নীল কারখানা নদীর তীরে গড়ে উঠত কেন?

ঘ) সে সময় এদেশে কত নীলকুঠি স্থাপিত হয়েছিল?

সংগ্রহ করতে। চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারেন। এই লেখাটি এখলাসউদ্দিন আহ্‌মেদ সম্পাদিত ও রঙিন ফানুস প্রকাশনী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত রঙিন ফানুস নামের বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

সংক্ষেপে রচনার কথা: ইংরেজ আমলে বাংলাদেশের নীলের চাষ হত। পৃথিবীর সেরা সেই নীল বিদেশে বিক্রি করে নীলকরেরা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করত। নীল গাছ জলে পচিয়ে জ্বাল দিয়ে নীল তৈরি করা হত। নীল তৈরি করতে প্রচুর জল লাগে বলে বেশির ভাগ নীল কারখানা গড়ে উঠেছিল নদীর ধারে। হুগলিতে নীলের চাষ প্রথম শুরু করেছিলেন ফরাসি বণিক বোর্নাদ। তারপর ইংরেজরা অন্যান্য জেলায় তা ছড়িয়ে দেয়। নীলচাষ হত দুভাবে। নীলকর নিজের জমিতে নিজের খরচায় নীলচাষ করলে তাকে বলা হত আবাদি। নীলকরের কাছ থেকে আগাম টাকা নিয়ে চাষি নিজের জমিতে নীলচাষ করলে তাকে বলা হত রায়তি। নীলের ব্যবসায় খুব লাভজনক। সে জন্য নীলকররা কম খরচে বেশি নীল উৎপাদন করে বিদেশে বিক্রি করে আরও বেশি লাভ করার জন্য নীলচাষিদের নানাভাবে ঠকাত, তাদের ওপর নির্যাতন চালাত। এই অন্যায়ের প্রতিকার চেয়ে আদালতে নালিশ করেও নীলচাষিরা সুবিচার পেত না। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে চাষিরা জোট বেঁধে বিদ্রোহ করে নীলচাষ বন্ধ করে দিল। দেশের গণ্যমান্য মানুষ তাঁদের এই সংগ্রাম সমর্থন করলেন। নীলকরদের অত্যাচার নিয়ে 'নীলদর্পণ' নাটক লিখলেন দীনবন্ধু মিত্র। বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ সরকার 'নীল কমিশন' গঠন করল নীলচাষিদের শান্ত করতে। তদন্ত করে কমিশন জানাল, চাষিদের অভিযোগ সত্য। কিন্তু নীলচাষ বন্ধ করার কোনো পরামর্শ দিল না। চাষিরা নিজেরাই নীল বোনা বন্ধ করে দিল। অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে নীলচাষিরা অত্যাচারী ও শোষকদের রুখে দিল। সারা বাংলায় বন্ধ হয়ে গেল নীলচাষ। নীলকরদের অত্যাচারের সাক্ষী হয়ে এখনও কিছু কিছু নীলকুঠি দাঁড়িয়ে আছে বাংলার গ্রামেগঞ্জে।

শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ

নীল—নীল রং উৎপাদক গাছ। indigo। অন্য মানে : রং বিশেষ, গাজনের শিব, নীলবর্ণবিশিষ্ট

জ্বাল দেওয়া—সিদ্ধ করা বা ফোটানো

নির্যাস—রস, আঠা

নীলকুঠি—নীল প্রস্তুত করার কারখানা ও নীলকরদের কাছারি বা অফিস

নীলকর—প্রধানত ভারতে ইয়োরোপীয় নীল উৎপাদক, নীলচাষকারী

চুক্তি—কোনো বিষয়ে দু-পক্ষের মধ্যে আদানপ্রদানের কারও শর্ত। agreement। হিন্দি—চুকতি

আগাম—কেনার আগেই দেওয়া কোনো জিনিসের আংশিক দাম, অগ্রিম, বায়না। advance

সংঘাত—পারস্পরিক দ্বন্দ্ব

অত্যাচার—অন্যায় আচরণ, পীড়ন। অতি + আচার। বিশেষ্য। বিশেষণ—অত্যাচারী, অত্যাচারিত

আদালত—বিচারালয়, বিচারশালা, ন্যায়ালয়। court

রায়—বিচারকের সিদ্ধান্ত, আদেশ। অন্য মানে : হিন্দুদের পদবি, উপাধি বিশেষ

একজোট—সম্মিলিত, দলবদ্ধ, একাট্টা

বিদ্রোহ—শাসন অগ্রাহ্য করা, বশ্যতা অস্বীকার করা। বিশেষ্য। বিশেষণ —বিদ্রোহী

বুনবে—বোনা শব্দ থেকে। বপন করা, শস্যের বীজ ছড়ানো — ধান বোনা। অন্য মানে : সুতো, রেশম বা পশম দিয়ে কাপড় ইত্যাদি তৈরি করা, বয়ন করা—তাঁত বোনা, জাল বোনা

রিপোর্ট—report। ঘটনা অভিজ্ঞতা তদন্ত ইত্যাদির লিখিত বিবরণ, প্রতিবেদন। অন্য মানে : কারও কাছে বিরুদ্ধে নালিশ।

শোষণ—জমিদার বা মালিক কর্তৃক প্রজা বা শ্রমিককে ঠকানো। exploitation। অন্য মানে : কোনো জিনিসের রস টেনে তা শুকিয়ে ফেলা

শোষক—এখানে মানে : যে অন্যায়ভাবে শোষণ করে। exploiter। অন্য মানে : যে তরল পদার্থ শুষে নেয়। বিশেষণ। বিশেষ্য—শোষণ। বিপরীত—শোষিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)

ঙ) সে যুগে নীলচাষিদের মাসিক বেতন কত ছিল?

চ) ইংরেজ বিচারকরা কার পক্ষে রায় দিতেন?

৩. ছোটো প্রশ্ন: সংক্ষেপে উত্তর দাও

ক) '...এদেশে প্রথম নীলচাষ শুরু করেন'— কে? কবে? কোথায়? তারপর কারা? কোথায় কোথায়?

খ) 'ইংরেজরা আমাদের দেশে দুভাবে নীলচাষ করাতো'—

একটির নাম কী? তার নিয়মগুলি কী কী?

দ্বিতীয়টির নাম কী? তার নিয়মগুলি কী কী?

গ) 'ইংরেজ নীলকররা কেন এমন করত?'— কী করত? কেন করত?

৪. বড়ো প্রশ্ন : পাঠ্যাংশের সাহায্য নিয়ে নিজের ভাষায় উত্তর লেখো।

ক) 'নীল বিদ্রোহ'— এই শিরোনাম লেখাটির ক্ষেত্রে কতখানি সঙ্গত হয়েছে বুঝিয়ে লেখো।

খ) 'নীলকরদের অতিরিক্ত লোভই নীলচাষিদের বিদ্রোহী করে তুলেছিল'— আলোচনা করো।

গ) নীলবিদ্রোহ সে সময়কার সমাজে যে আলোড়ন তুলেছিল তার পরিচয় দাও।

ঘ) কোন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার 'নীল কমিশন' গড়তে বাধ্য হয়েছিল? কমিশন তার রিপোর্টে কী বলেছিল?

ঙ) 'নীল বিদ্রোহ'— এই রচনাটির সারাংশ লেখো।

৫. ব্যাখ্যা লেখো:

অবশেষে ১৮৫৯-৬০ সালে বিদ্রোহ করল নীলচাষিরা।

৬. অল্পকথায় পরিচয় দাও:

ক) নীলদর্পণ খ) ইন্ডিগো কমিশন

ব্যাকরণ

১. নির্দেশ অনুযায়ী উত্তর লেখো:

লিঙ্গ পরিবর্তন করো	:	মালিক	পুরুষ
সমাসের নাম লেখো	:	নীলকুঠি	নীলকর
সন্ধিবিচ্ছেদ করো	:	পরিষ্কার	অত্যাচর
কোনটা কোন বচন	:	লেখক	চাষিরা
বিপরীতার্থক শব্দ লেখো	:	বিচার	বিরুদ্ধে
সমার্থক শব্দ লেখো	:	একজোট	বিখ্যাত
কোনটা কোন পুরুষ	:	তারা	তোমাদের

২. এককথায় প্রকাশ করো:

বিচারকরে সিদ্ধান্ত ও আদেশ দুপক্ষের মধ্যে আদানপ্রদানের শর্ত ঘটনা বা অভিজ্ঞতার লিখিত বিবরণ

শাসন অগ্রাহ্য করা

জানো কি?

ছ-সাত বছরের অপু তার বাবা হরিহরের হাত ধরে এই প্রথম বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে বেড়াতে বেরিয়েছে। কিছুদূর যাবার পর তারা নদীর ধারের বাবলা ও শিমুল গাছের আড়ালে একটা বড়ো ইটের পাঁজার মতো জিনিস দেখতে পেল, ওটা পুরানো কালের নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ।

'হরিহর বলিল—কুঠি কুঠি বলছিলে, এই দ্যাখো খোকা সাহেবদের কুঠি—দেখেছো?...

'কুঠির হাতার কিছু দূরে কুঠিয়াল লারমার সাহেবের একমাত্র শিশুপুত্রের সমাধি পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে।... নিকটে গেলে অনেক কালের কালো পাথরের ফলকে এখনও পড়া যায়—

Here lies Edwin Lermor,
The only son of John & Mrs. Lermor
Born May 13, 1853, Died April 27, 1860

'অন্য অন্য গাছপালার মধ্যে একটি বন্য সোঁদাল গাছ তাহার উপর শাখাপত্রের ছায়া বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে... জোর হাওয়ায় তাহার পীত পুষ্পস্তবক সারা দিনরাত ধরিয়া বিস্মৃত বিদেশি শিশুর জন্য সমাধির উপর রাশি রাশি পুষ্প ঝরাইয়া দেয়। সকলে ভুলিয়া গেলেও বনের গাছপালা শিশুটিকে এখনও ভোলে নাই।'

—পথের পাঁচালী / বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

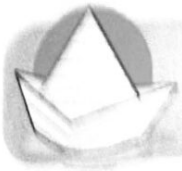

নীল বিদ্রোহ কেন সফল হল বলে তোমার মনে হয়? অল্প কথায় লেখো।

বলো তো দীনবন্ধু মিত্রের বাংলা নাটক 'নীলদর্পন' ইংরেজিতে কে অনুবাদ করেছিলেন?

সিপাহি বিদ্রোহ আর নীল বিদ্রোহ সম্বন্ধে ভালো করে পড়ো। তারপর দেখো তো যে এই দুই বিদ্রোহের মধ্যে তুমি কী কী মিল বা অমিল খুঁজে পাচ্ছো।

১২. শ্রাবণে

অক্ষয়কুমার বড়াল

এই কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি গ্রামাঞ্চলের বর্ষাকালের একটি ছবি এঁকেছেন। পড়ুয়ারা এই ছবির সাথে শহরের বর্ষার চিত্রের একটা স্বাভাবিক তফাত খুঁজে পাবে।

সারাদিন একখানি জল-ভরা কালো মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ;
বসে' জানালার পাশে, সারাদিন আছি চেয়ে —
জীবনের আজি অবকাশ।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে-দোলে
ফুলগুলি পড়েছে খসিয়া;
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়েছে লুটি';
পাখিগুলি ভিজিছে বসিয়া।

কোথা সাড়া-শব্দ নাই, পথে লোক-জন নাই,
হেথা-হোথা দাঁড়ায়েছে জল;
ভিজা ঘাসঝাড় হ'তে লাফায় ফড়িং কভু,
জলায় ডাকিছে ভেকদল।
চাতক, ঝাড়িয়া পাখা, ডাকিয়া ফটিক-জল,
ছাড়ি নীড়, উঠিছে আকাশে;
কদম্ব কেতকী-বাস কাঁপিছে বাতাসে ধীরে,
গেছে ধরা ঢেকে শ্যাম ঘাসে।

মাঠে নবশ্যাম খেতে কচি কচি ধান গাছ
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে —
কোলে লুটিতেছে জল টল্-মল্ থল্-থল্,
বুকে বায়ু থর-থর নাচে।
সুদূরে মাঠের শেষে জমে আছে অন্ধকার,
কোথা যেন হ'তেছে প্রলয়!
কুটিরে বসিয়া গৃহী পুত্র-পরিবার সহ
কত দুর্যোগের কথা কয়।

জেনে রাখো

সংক্ষেপে কবির কথা: অক্ষয়কুমার বড়াল। জন্ম ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার চোরবাগান অঞ্চলে। বাবা, কালীচরণ বড়াল। হেয়ার স্কুলে পড়তেন কিন্তু শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। ছাত্রজীবনেই কবিতা লেখায় হাতেখড়ি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাছে। তাঁর লেখা কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ : এষা, প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, ভুল, শঙ্খ। মৃত্যু ১৯ জুন ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ। সংকলিত কবিতাটি কিশোর কবিতা সঞ্চয়ন থেকে নেওয়া হয়েছে। মূল কবিতাটি মোট ৬টি স্তবক। এখানে কেবল প্রথম, দ্বিতীয় এবং পঞ্চম স্তবক সংকলিত।

সংক্ষেপে কবিতা কথা: সারাদিন জলভরা একখানা কালো মেঘ আকাশ ঢেকে রয়েছে। কবির হাতে আজ সময় আছে। তিনি সারাদিন জানলার পাশে বসে বাইরে তাকিয়ে আছেন। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। গাছগুলো হেলে পড়ছে। ফুল খসে পড়ছে বোঁটা থেকে। গাছ বেয়ে-ওঠা নরম লতার মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।

বর্ষায় পথে লোকজন নেই। চারিদিক নিঃশব্দ নীরব। এখানে-ওখানে জল জমে আছে। ভিজে ঘাস থেকে কখনো ফড়িং লাফিয়ে উঠছে। জলার ধারে বসে ব্যাঙ ডাকছে। চাতক পাখি ডানা থেকে বৃষ্টির জল ঝেড়ে ফেলে 'ফটিক-জল' 'ফটিক-জল' বলতে বলতে বাসা থেকে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। কদম ও কেতকী ফুলের সৌরভে কেঁপে উঠেছে মৃদু বাতাস। সবুজ ঘাসে ঢেকে গেছে মাটি।

ধান খেতে টল্‌মল করছে জল। সবুজ রঙের কচি কচি ধান গাছের কোল পর্যন্ত জলে ডুবে আছে। কেবল মাথাগুলো জেগে আছে জলের ওপর। বাতাসে ধানগাছগুলো যেন নাচছে। অনেক দূরে, মাঠের শেষে অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। দেখে মনে হয় কোথাও যেন প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। গৃহস্থ তার কুটিরে বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে বসে অতীতের কোনো দুর্যোগের অভিজ্ঞতার গল্প শোনাচ্ছে।

শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণ

অবকাশ—ছুটি, অবসর। বিপরীত—অনবকাশ
হেথা-হোথা—এখানে-ওখানে
ঘাসঝাড়—ঘাসের গুচ্ছ
ফড়িং—এক রকমের পতঙ্গ
জলা—যেখানে জল জমে থাকে, বিল
ভেকদল—ব্যাঙের দল
নীড়—পাখির বাসা, কুলায়
কদম্ব—কদম। বর্ষাকালের ফুল
কেতকী-বাস—কেয়াফুলের গন্ধ
ধরা—পৃথিবী, ধরণী
শ্যাম—এখানে মানে সবুজ রঙের। অন্য মানে—কৃষ্ণবর্ণ, ঘননীল
নবশ্যাম খেতে—খেতে সবুজ রঙের নতুন ধানগাছ
প্রলয়—ধ্বংস। বিশেষ্য। বিশেষণ—প্রলয়ংকর
দুর্ভোগ—ঝড়বৃষ্টির সময়। তৎপুরুষ

পদ্য থেকে গদ্য

রহিয়াছে—রয়েছে **ঢাকিয়া**—ঢেকে **খসিয়া**—খসে **ভিজিছে**—ভিজছে **বসিয়া**—বসে
কভু—কখনো **ডাকিছে**—ডাকছে **ঝাড়িয়া**—ঝেড়ে **ডাকিয়া**—ডেকে **উঠিছে**—উঠছে
কাঁপিছে—কাঁপছে **জাগাইয়া**—জাগিয়ে **হ'তেছে**—হচ্ছে **কয়**—বলে

এই কবিতা : হাইফেন-যুক্ত শব্দ

জল-ভরা **হেলে-দোলে** **সাড়া-শব্দ** **লোক-জন** **হেথা-হোথা** **ফটিক-জল** **কেতকী-বাস** **টল্-মল্**
থল্-থল্ **থর-থর** **পুত্র-পরিবার**

মনে রেখো

কবিতার ছন্দ ঠিক রাখার জন্য— হেলে-দোলে, সাড়া-শব্দ, লোক-জন, টল্-মল্, থল্-থল্, থর-থর— এই শব্দগুলির মাঝে হাইফেন দেওয়া হয়েছে। যখন গদ্যে এই শব্দগুলি লিখবে তখন হবে: হেলেদোলে, সাড়াশব্দ, লোকজন, টলমল, থলথল, থরথর।

ব্যাখ্যা

চাকত, ঝাড়িয়া পাখা, ডাকিয়া ফটিক-জল,
ছাড়ি নীড়, উঠিছে আকাশে;

চাতক পাখি নিয়ে একটা লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। চাতক নাকি বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য জল পান করে না। সেই জন্যে সে 'ফটিক জল' 'ফটিক জল' বলে ডাকে। আসলে গ্রীষ্মকালে চাতকের 'চি-চিট্-চিট্' ডাকটাই ওইরকম শোনায় আর মনে হয় পিপাসায় কাতর হয়ে সে মেঘের কাছ থেকে জল চাইছে। কাজেই বর্ষার জল পেয়ে চাতক খুব খুশি। সে 'ফটিক জল' পাতা ডানার জল ঝেড়ে ফেলে, বাসা ছেড়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে।

কতটা শেখা হল

১. মুখে মুখে বলো:

ক) 'শ্রাবণে' কবিতাটি কার লেখা?

খ) শ্রাবণ মাস কোন ঋতুতে পড়ে?

গ) ফড়িং কোথা থেকে লাফিয়ে উঠছে?

ঘ) চলিত ভাষায় কদম্ব ফুলের নাম কি?

ঙ) কেতকী চলিত ভাষায় কোন ফুল?

২. এককথায় উত্তর দাও: ডানদিক থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে বাঁ-দিকের ফাঁকা জায়গায় বসাও

ক) জল-ভরা	ভেদকল
খ) ..... পড়েছে খসিয়া;	মাথাগুলি
গ) ..... ভিজিছে বসিয়া।	অন্ধকার
ঘ) জলায় ডাকিছে .....।	কালো মেঘ
ঙ) ..... জাগাইয়া আছে।	ফুলগুলি
চ) জমে আছে	পাখিগুলি

৩. ছোটো প্রশ্ন : সংক্ষেপে উত্তর দাও

ক) 'সারাদিন আছি চেয়ে —' কে চেয়ে আছেন? কেন চেয়ে আছেন? কোথায় বসে চেয়ে আছেন?

খ) 'ছাড়ি নীড়, উঠিছে আকাশে,'— কে উঠছে? কেন উঠছে? কী ডাক ডেকে উঠছে?

গ) 'মাথাগুলি জাগাইয়া আছে—' কারা এবং কোথায় মাথা জাগিয়ে আছে?

ঘ) 'কত দুর্যোগের কথা কয়।'—কে? কাদের কাছে? কোন দুর্যোগের কথা বলছে?

৪. বড়ো প্রশ্ন : শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে নিজের ভাষায় উত্তর লেখো

ক) 'শ্রাবণে' কবিতায় কবি বর্ষার যে ছবিটি এঁকেছেন তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করো।

খ) 'শ্রাবণে' কবিতাটির নামকরণ কতখানি সার্থক হয়েছে বুঝিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ

১. 'গুলি' যোগ করে বহুবচন করা হয়েছে, কবিতা থেকে বেছে নিয়ে এইরকম দুটি শব্দ লেখো।

২. সমার্থক লেখো: ঝিমিয়ে   কাঁপিয়ে   কথা   ঝঞ্ঝা   বৃষ্টি

৩. পদ-পরিবর্তন করো : মেঘ   আকাশ   শ্যাম   মান   জল

ভারতবর্ষে সবচাইতে বেশি বৃষ্টি কোথায় হয় তা খুঁজে বার করো। জায়গাটি কোন রাজ্যে অবস্থিত এবং সেখানে কত বৃষ্টি হয়?

প্রথম অধ্যায়

বিসর্গ সন্ধি ও খাঁটি বাংলা সন্ধি

বিসর্গ সন্ধি

পূর্বপদের বিসর্গের সঙ্গে পরপদে ব্যঞ্জন ধ্বনি বা স্বরধ্বনির সন্ধিকেই বলা হয় বিসর্গ সন্ধি। প্রধানত সংস্কৃত শব্দেই এই সন্ধির প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

বিসর্গ দুই প্রকার (১) স-জাত বিসর্গ ও (২) র-জাত বিসর্গ।

শব্দের শেষে 'স' স্থানে যে বিসর্গ হয় তাই স-জাত বিসর্গ। যেমন—আশীস্ = আশীঃ, পুরস্ = পুরঃ, তেজস্ = তেজঃ, জ্যোতিস্ = জ্যোতিঃ, ধুনস্ = ধনুঃ, চক্ষুস্ = চক্ষুঃ।

পদের শেষে 'র'-এর স্থানে যে বিসর্গ হয় তাকে র-জাত বিসর্গ বলে। যেমন—অন্তর = অন্তঃ, নির্ = নিঃ, পুনর্ = পুনঃ, প্রাতর্ = প্রাতঃ, স্বর = স্বঃ

১।। চ্ বা ছ পরে থাকলে পূর্ববর্তী বিসর্গের স্থানে 'শ' হয়।

শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ।
নিঃ + ছিদ্র = নিশ্ছিদ্র।
নিঃ + চয় = নিশ্চয়।
সদাঃ + ছিন্ন = সদাশ্ছিন্ন।
পুরঃ + চরণ = পুরশ্চরণ।
নিঃ + চল্ = নিশ্চল।
নভঃ + চর্ = নভশ্চর।
দুঃ + চরিত্র = দুশ্চরিত্র।
শিরঃ + চূড়ামণি = শিরশ্চূড়ামণি।
নিঃ + চিন্ত = নিশ্চিন্ত।
দুঃ + ছেদ্য = দুশ্ছেদ্য।
নভঃ + চক্ষু = নভশ্চক্ষু।
নিঃ + চিহ্ন = নিশ্চিহ্ন।
দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা।
মনঃ + চক্ষু = মনশ্চক্ষু।
শিরঃ + চুম্বন = শিরশ্চুম্বন।

২।। অ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণে যুক্ত বিসর্গের পর কোনো স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্গ, ক, র, ল, ব, হ থাকলে বিসর্গ স্থানে 'র'। র্ পরের বর্ণে যুক্ত হয় বা পরের ব্যঞ্জনের মাথায় রেফ (´) হয়ে বসে।

নিঃ + অবধি = নিরবধি।
নিঃ+ আনন্দ = নিরানন্দ।
নিঃ + আকার = নিরাকার।
নিঃ + অর্থক = নিরর্থক।
নিঃ + উদ্যম = নিরুদ্যম।
চতুঃ + দিক = চতুর্দিক।
আবিঃ + ভাব = আবির্ভাব।
দুঃ + আত্মা = দুরাত্মা।
দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা।
দুঃ + জন = দুর্জন।
নিঃ + দ্বন্দ্ব = নির্দ্বন্দ্ব।
নিঃ + উপমা = নিরুপমা।
নিঃ + আশ্রয় = নিরাশ্রয়
দুঃ + অভিমান = দুরভিমান।
চতুঃ + ভুজ = চতুর্ভুজ।
দুঃ + যোগ = দুর্যোগ।

নিঃ + মল = নির্মল।
নিঃ + উৎসাহ = নিরুৎসাহ।
নিঃ + আমিষ = নিরামিষ।
নিঃ + ঈশ্বর = নিরীশ্বর।
নিঃ + ঈহ = নিরীহ।
নিঃ + ঝর = নির্ঝর।
নিঃ + নয় = নির্ণয়।
বহিঃ + ভূত = বহির্ভূত।
বহিঃ + ইন্দ্রিয় = বহিরিন্দ্রিয়।
নিঃ + আড়ম্বর = নিরাড়ম্বর।
নিঃ + উপাধিক = নিরুপাধিক।
বহিঃ + অঙ্গ = বহিরঙ্গ।
দুঃ + বল = দুর্বল।
নিঃ + আভরণ = নিরাভরণ।
দুঃ + নিবার = দুর্নিবার।

দুঃ + গতি = দুর্গতি।
দুঃ + লভ = দুর্লভ।
দুঃ + অদৃষ্ট = দুরদৃষ্ট
নিঃ + বিকল্প = নির্বিকল্প।
চতুঃ + অঙ্গ = চতুরঙ্গ।
চতুঃ + বেদ = চতুর্বেদ।
নিঃ + উদ্‌বেগ = নিরুদ্‌বেগ।
জ্যোতিঃ + ঈশ = জ্যোতিরীশ।
নিঃ + আময় = নিরাময়।
নিঃ + বেদ = নির্বেদ।
নিঃ + অতিশয় = নিরতিশয়।
জ্যোতিঃ + ইন্দ্র = জ্যোতিরিন্দ্র।
আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ।
নিঃ + অবয়ব = নিরবয়ব।
নিঃ + অলংকার = নিরলংকার।

৩।। ক, খ, প, ফ—যে কোনো একটি পরপদের প্রথম বর্ণ হলে নিঃ, অধিঃ, বহিঃ, দুঃ, চতুঃ প্রভৃতি শব্দের বিসর্গ স্থানে 'ষ্' হয়।

নিঃ + প্রয়োজন = নিষ্প্রয়োজন।
নিঃ + প্রভ = নিষ্প্রভ।
নিঃ + করুণ = নিষ্করুণ।
আবিঃ + কার = আবিষ্কার।
বহিঃ + কৃত = বহিষ্কৃত।
নিঃ + কাম = নিষ্কাম।
নিঃ + কৃত = নিষ্কৃত।

দুঃ + পাচ্য = দুষ্পাচ্য।
চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ।
চতুঃ + পার্শ্বস্থ = চতুষ্পার্শ্বস্থ।
ভ্রাতুঃ + পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র।
দুঃ + কৃতি = দুষ্কৃতি।
ধনুঃ + পাণি = ধনুষ্পাণি।
আয়ুঃ + কাল = আয়ুষ্কাল।

কিন্তু নীচের কয়েকটি ক্ষেত্রে : (বিসর্গ) অক্ষুণ্ণ থাকে। যেমন—

মনঃ + ক্ষুণ্ণ = মনঃক্ষুণ্ণ।
জ্যোতিঃ + পুঞ্জ = জ্যোতিঃপুঞ্জ।
মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট।
স্বতঃ + প্রবৃত্ত = স্বতঃপ্রবৃত্ত।

শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া।
স্রোতঃ + পথ = স্রোতঃপথ।
মনঃ + ক্ষোভ = মনঃক্ষোভ।
অন্তঃ + পুর = অন্তঃপুর।

৪।। অ-কার কিংবা আ-কার-এর পর বিসর্গ থাকলে এবং পরপদের প্রথম বর্ণ ক, খ, প, ফ যোকোনো একটি হলে বিসর্গ স্থানে 'স' হয়। যেমন—

তিরঃ + কৃত = তিরস্কৃত।
অয়ঃ + কান্ত = অয়স্কান্ত।
শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর।
পুরঃ + কার = পুরস্কার।

তেজঃ + স্ক্রিয়তা = তেজস্ক্রিয়তা
তিরঃ + করণী = তিরস্করণী।
নমঃ + কার = নমস্কার।
যশঃ + কর = যশস্কর।

তিরঃ + কৃত = তিরস্কৃত।
মনঃ + কামনা = মনস্কামনা।

৫।। পূর্বপদের শেষস্থ অ-কারের পর যদি র-জাত বিসর্গ থাকে এবং কোনো স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ কিংবা য, র, ল, হ এদের যে কোনো একটি যদি পরপদের প্রথম বর্ণ হয়। তাহলে র-জাত বিসর্গ স্থানে 'র' হয়। এই র-পূর্ণবর্ণে যুক্ত হয়। যেমন—

পুনঃ + উদ্ধার = পুনরুদ্ধার।
পুনঃ + যাত্রা = পুনর্যাত্রা।
পুনঃ + ঈক্ষণ = পুনরীক্ষণ।
পুনঃ + অবগতি = পুনরবগতি।
অহঃ + নিশ = অহর্নিশ।
পুনঃ + বার = পুনর্বার।
অন্তঃ + লঘু = অন্তর্লঘু।
অন্তঃ + ইন্দ্রিয় = অন্তরিন্দ্রিয়।
অন্তঃ + লোক = অন্তর্লোক।
অন্তঃ + নিহিত = অন্তর্নিহিত।
প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ।
অন্তঃ + হিত = অন্তর্হিত।
অন্তঃ + ভূক্ত = অন্তর্ভূক্ত।
অন্তঃ + গত = অন্তর্গত।
অন্তঃ + ঈক্ষ = অন্তরীক্ষ।
পুনঃ + অপি = পুনরপি।
প্রাতঃ + উত্থান = প্রাতরুত্থান।
প্রাতঃ + ভ্রমণ = প্রাতর্ভ্রমণ।
অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা।

৬।। পরপদের প্রথম বর্ণর হলে পূর্বপদের শেষস্থ 'র' জাত বিসর্গের লোপ হয় এবং পূর্বস্থ স্বরবর্ণটি দীর্ঘ হয়। যেমন—

চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষূরোগ।
জ্যোতিঃ + রূপা = জ্যোতীরূপা
নিঃ + রত = নীরত।
নিঃ + রস = নীরস।
নিঃ + রোগ = নীরোগ।
নিঃ + রব = নীরব।
নিঃ + রক্ত = নীরক্ত।
নিঃ + রদ = নীরদ।
নিঃ + রজ = নীরজ।
নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র।

৭।। অয়ঃ, যশঃ, শ্রেয়ঃ, পুরঃ, তিরঃ, নমঃ প্রভৃতি সন্ধির পূর্বপদে থাকলে বিসর্গস্থানে 'স' হয়।

অয়ঃ + কান্ত = অয়স্কান্ত।
যশঃ + কর = যশোস্কর।
তিরঃ + কার = তিরস্কার।
নমঃ + কার = নমস্কার।
শ্রেয়ঃ + কর = শ্রেয়স্কর।
মনঃ + কাম = মনস্কাম।

৮।। অ-কারের পর বিসর্গ এবং পরে বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্গ বা য, র, ল, ব, হ থাকলে অ-কার ও ও-কার মিলে ও-কার বর্ণ হয়। ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

ছন্দঃ + বদ্ধ = ছন্দোবদ্ধ।
পুরঃ + হিত = পুরোহিত।
বয়ঃ + বৃদ্ধ = বয়োবৃদ্ধ।
সরঃ + জ = সরোজ।
মনঃ + মোহিনী = মনোমোহিনী।
অধঃ + গতি = অধোগতি।
পুরঃ + ধা = পুরোধা।
তেজঃ + দীপ্ত = তেজোদীপ্ত।
শ্রেয়ঃ + ধর্মী = শ্রেয়োধর্মী।
সদ্যঃ + মৃত = সদ্যোমৃত।
সর্বতঃ + ভাবে = সর্বতোভাবে।
তেজঃ + ময়ী = তেজোময়ী।

মনঃ + দীপ = মনোদীপ।
তপঃ + বন = তপোবন।
তিরঃ + ধান = তিরোধান।
সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত।
অধঃ + মুখ = অধোমুখ।
মনঃ + নির্ভর = মনোনির্ভর।
যশঃ + লাভ = যশোলাভ।
অধঃ + রেখ = অধোরেখ।
নভঃ + মণ্ডল = নভোমণ্ডল।
যশঃ + লিপ্সা = যশোলিপ্সা।
শিরঃ + রত্ন = শিরোরত্ন।
ত্রয়ঃ + দশ = ত্রয়োদশ।
সরঃ + বর = সরোবর।
ত্রয়ঃ + দশী = ত্রয়োদশী।
শিরঃ + দেশ = শিরোদেশ।
শিরঃ + ধর্ম = শিরোধর্ম।
যশঃ + দা = যশোদা।
মনঃ + মোহন = মনোমোহন।
নভঃ + লোভী = নভোলোভী।
স্বতঃ + বিবুদ্ধ = স্বতোবিবুদ্ধ।
অকুতঃ + ভয় = অকুতোভয়।
পয়ঃ + ধি = পয়োধি।
মনঃ + যোগ = মনোযোগ।

৯। বিসর্গের পরে ট, ঠ থাকলে বিসর্গস্থানে 'ষ' হয়। অর্থাৎ ট-এর বেলায় 'ষ্ট' এবং ঠ-এর বেলা 'ষ্ঠ' হয়।

নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর।
ধনুঃ + টংকার = ধনুষ্টংকার।
চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়।

১০। প্রথম পদের অন্তে অ-কারের পর যদি বিসর্গ থাকে এবং পরপদের প্রথম বর্ণ অ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ হয়। তখন বিসর্গের লোপ হয়। লোপের পর আর সন্ধি হয় না।

অতঃ + এব = অতএব।
শিরঃ + উপরি = শির-উপরি।
বক্ষঃ + উপরি = বক্ষ-উপরি।
মনঃ + আশা = মন-আশা।

১১। বিসর্গের পরে শ, ষ, স থাকলে বিসর্গের কোনো লোপ হয় না। যেমন—

দুঃ + শাসন = দুঃশাসন।
মনঃ + সংযম = মনঃসংযম।
দুঃ + শীল = দুঃশীল।

১২। পরপদের প্রথমে স্ত, স্থ, স্প থাকলে পূর্বপদের অন্তেস্থিত বিসর্গ বিকল্পে লুপ্ত হয়। যেমন—

বক্ষঃ + স্থল = বক্ষঃস্থল/বক্ষস্থল।
নিঃ + স্পৃহ = নিঃস্পৃহ/নিস্পৃহ।
নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ/নিস্পন্দ।
মনঃ + স্থ = মনঃস্থ/মনস্থ।
অন্ত + স্থ = অন্তঃস্থ/অন্তস্থ।
দুঃ + স্থ = দুঃস্থ/দুস্থ।
মনঃ + স্থিত = মনঃস্থিত/মনস্থিত।

নিপাতনে সিদ্ধ বিসর্গ সন্ধি

নিপাতন শব্দের একটি অর্থ ব্যাকরণের নিয়মের ব্যতিক্রম। নিয়মবহির্ভূত অথচ প্রচলিত এই রকম অনেক **কিছুকেই নিপাতন সিদ্ধ সন্ধি হিসেবে ধরা হয়।** সন্ধিতেই নিপাতন শব্দটির বেশি ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

নিপাতনে সিদ্ধ কয়েকটি বিসর্গ সন্ধির উদাহরণ :

গীঃ + পতি = গীষ্পতি/গীপতি/গীঃপতি।
অহঃ + রাত্র = অহোরাত্র।
অহঃ + অহঃ = অহরহঃ।
তেজঃ + পুঞ্জ = তেজঃপুঞ্জ।
পয়ঃ + প্রণালী = পয়ঃপ্রণালী।
মনঃ + ঈষা = মনীষা।
মনঃ + রথ = মনোরথ।
অহঃ + নিশি = অহর্নিশি।
অহঃ + পতি = অহঃপতি।
অন্তঃ + করণ = অন্তঃকরণ।

খাঁটি বাংলা সন্ধি

তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি বাংলা শব্দের ক্ষেত্রে যে সন্ধির নিয়ম প্রচলিত তাকেই খাঁটি বাংলা সন্ধি বলা হয়।

সংস্কৃত সন্ধি যেখানে বাধ্যতামূলক, বাংলায় সেখানে সন্ধি হয় না। যেমন আমরা প্রীতি-উপহার, স্ত্রী-আচার, দৃষ্টি আকর্ষণ বলি বা লিখি। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যে সন্ধি হয় তা এরূপ—স্ত্রাচার, প্রীত্যুপহার বা দৃষ্ট্যাকর্ষণ। কিন্তু এইসব শব্দ আমরা বাংলায় ব্যবহার করি না। দুএকটি ক্ষেত্র ছাড়া সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে তদ্ভব, দেশি বা বিদেশি শব্দের সন্ধি না করাই শ্রেয়। যেমন—টেবিল + উপরি = টেবিলোপরি, কিংবা শাল + আবৃত = শালাবৃত আমরা লিখি না বা বলিও না। তবে চাষাবাদ, হিসাবানা, হিসাবাদি, আইনানুসারে প্রভৃতি কিছু কিছু সন্ধিবদ্ধ শব্দ বাংলায় চলে। তবে শব্দগুলি হিসাব-আদি, আইন-অনুসারে, চাষ-আবাদ লিখলে ভালো শোনায়।

বাংলা সন্ধি সাধারণভাবে দ্রুত উচ্চারণের জন্য সংঘটিত হয়। যেমন—

হাত + টান = হাট্যান, হাত + ছাড়া = হাচ্ছাড়া প্রভৃতি। খাঁটি বাংলায় বিসর্গ সন্ধি নেই। তাই খাঁটি বাংলা সন্ধি দু-রকমের—বাংলা স্বরসন্ধি ও বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি।

বাংলা স্বরসন্ধি

১।। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ঈ-কার থাকলে এ-কার হয়। যেমন—

ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী।
মুণ্ড + ঈশ্বরী = মুণ্ডেশ্বরী।
যশোর + ঈশ্বরী = যশোরেশ্বরী।
ফুল + ঈশ্বরী = ফুলেশ্বরী।
সিন্ধ + ঈশ্বরী = সিন্ধেশ্বরী

২। পাশাপাশি দুটি স্বরবর্ণ থাকলে একটির লোপ হয়। যেমন—

পূর্বস্বর লোপ :

তিল + এক = তিলেক।
যত + এক = যতেক।
ক্ষণ + এক = ক্ষণেক।
বার + এক = বারেক।
শত + এক = শতেক।
মিথ্যা + উক = মিথ্যুক।
দশ + এক = দশেক।
নিন্দা + উক = নিন্দুক।
এক + এক = একেক।
খান + এক = খানেক।
এত + এক = এতেক।
অর্ধ + এক = অর্ধেক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লিঙ্গ, বচন ও পুরুষ

লিঙ্গ

কোনো একটি শব্দ স্ত্রীজাতের না পুরুষ জাতের কিংবা স্ত্রী-পুরুষ উভয় অথবা কোনো জাতেরই নয়—শব্দের এই পরিচয়কেই লিঙ্গ পরিচয় বলে।

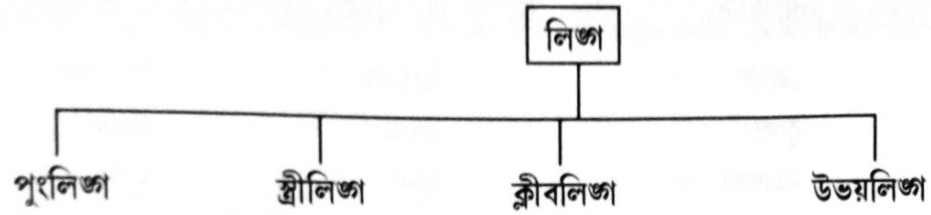

যে লিঙ্গের দ্বারা পুরুষ জাতীয় প্রাণীকে বোঝায় তাকে পুংলিঙ্গ বলে। যেমন—শিক্ষক, ছাত্র, বালক, পিতা, বাদশা, সাহেব, শ্বশুর প্রভৃতি।

যে লিঙ্গের দ্বারা স্ত্রী জাতীয় প্রাণীকে বোঝায় তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন—মা, পিতামহী, শিক্ষিকা, ছাত্রী, পিসি প্রভৃতি।

যে লিঙ্গের দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ কাউকে না বুঝিয়ে কোনো অচেতন পদার্থ বা উদ্ভিদ জাতীয় কোনো কিছুকে বোঝায় তাকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। যেমন—গাছ, পর্বত, চেয়ার ইত্যাদি।

যে শব্দের দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে বোঝায় তাকে উভয় লিঙ্গ বলে। যেমন—শিশু, সন্তান প্রভৃতি।

এছাড়াও কিছু কিছু প্রাণহীন বস্তুর ক্ষেত্রেও বিভিন্ন লিঙ্গ বোধ আরোপ করা হয়েছে। যেমন—নদী প্রাণহীণ বস্তু; কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ। আবার সূর্যও প্রাণহীন বস্তু কিন্তু পুংলিঙ্গ।

সমগ্র লিঙ্গ পর্যায়ের চার প্রকার লিঙ্গের মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই লিঙ্গ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই দুই জাতীয় লিঙ্গেরই প্রয়োজন আছে। কারণ ক্লীবলিঙ্গ ও উভয় লিঙ্গের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হয় না। তবে সর্বনাম পদেরও লিঙ্গ পরিবর্তিত হয়।

পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে এবং স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে পুংলিঙ্গে পরিবর্তন করার রীতিকেই লিঙ্গ পরিবর্তন বলে।
লিঙ্গ পরিবর্তন নানাভাবে করা হয়ে থাকে।

লিঙ্গ পরিবর্তনের রীতি

(ক) সম্পূর্ণ আলাদা শব্দ দিয়ে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ বোঝানো যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
স্বামী	স্ত্রী
ছেলে	মেয়ে
পুত্র	কন্যা
ভাই	বোন

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বর	বউ/কনে	সাহেব	মেম
বাদশা	বেগম	পিতা	মাতা
সম্রাট	সম্রাজ্ঞী	শ্বশুর	শাশুড়ি
জনক	জননী	রাজা	রানি
কর্তা	গিন্নি	এঁড়ে	বকনা

(খ) অনেক পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ বোঝানো হয়ে থাকে।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা	প্রিয়তম	প্রিয়তমা
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	প্রথম	প্রথমা
মহাশয়	মহাশয়া	মুগ্ধ	মুগ্ধা
শ্রেষ্ঠ	শ্রেষ্ঠা	পলাতক	পলাতকা
অনাথ	অনাথা	লুব্ধ	লুব্ধা
সদয়	সদয়া	মনোহর	মনোহরা
দ্বিতীয়	দ্বিতীয়া	নন্দন	নন্দনা
মৃত	মৃতা	অশ্ব	অশ্বা
পূজনীয়	পূজনীয়া	নবীন	নবীনা
বরণীয়	বরণীয়া	তনয়	তনয়া
কোকিল	কোকিলা	আদ্য	আদ্যা
শিষ্য	শিষ্যা	বৎস	বৎসা

(গ) যে সমস্ত শব্দের শেষে 'অক' বা 'ইক' আছে তাদের শেষে 'আ' প্রত্যয় যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অধ্যাপক	অধ্যাপিকা	বালক	বালিকা
সম্পাদক	সম্পাদিকা	গ্রাহক	গ্রাহিকা
অভিভাবক	অভিভাবিকা	রঞ্জক	রঞ্জিকা
নায়ক	নায়িকা	প্রাপক	প্রাপিকা
পাচক	পাচিকা	যাজক	যাজিকা
বাহক	বাহিকা	প্রকাশক	প্রকাশিকা
সহায়ক	সহায়িকা	গায়ক	গায়িকা
ব্যতিক্রম		সেবক	সেবিকা
রজক	রজকিনী		
গনক	গনকী		
চাতক	চাতকী		

(ঘ) জাতি বাচক 'অ'/'আ'-কারান্ত শব্দের শেষে 'ঈ' প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পাওয়া যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কর্তা	কর্ত্রী	পাত্র	পাত্রী
নেতা	নেত্রী	সৎ	সতী
ধাতা	ধাত্রী	বৃহৎ	বৃহতী
রচয়িতা	রচয়িত্রী	মহান	মহতী
প্রণেতা	প্রণেত্রী	গুণবান	গুণবতী
গ্রহীতা	গ্রহিত্রী	রূপবান	রূপবতী
শাস্ত্র	শাস্ত্রী	ভাগ্যবান	ভাগ্যবতী
সবিতা	সবিত্রী	গরীয়ান	গরীয়সী
পালয়িতা	পালয়িত্রী	বিলাসী	বিলাসিনী
পুত্র	পুত্রী	কপোত	কপোতী
ছাত্র	ছাত্রী	আত্রেয়	আত্রেয়ী
গৌর	গৌরী	অষ্টাদশ	অষ্টাদশী
নিশাচর	নিশাচরী	ঈদৃশ	ঈদৃশী
বিহঙ্গ	বিহঙ্গী	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
তাপস	তাপসী	সাপ্তাহিক	সাপ্তাহিকী
তরুণ	তরুণী	পঞ্চবট	পঞ্চবটী
কাক	কাকী	সিংহ	সিংহী
চকোর	চকোরী	বিদ্বান	বিদুষী
স্রষ্টা	স্রষ্টী	সন্ন্যাসী	সন্ন্যাসিনী
শ্রোতা	শ্রোত্রী	রাজা	রাজ্ঞী/রানি
বনচর	বনচরী	ষোড়শ	ষোড়শী
নদ	নদী	অনুচর	অনুরচরী
চিন্ময়	চিন্ময়ী	মার্জার	মার্জারী
সহচর	সহচরী	মৃণ্ময়	মৃণ্ময়ী
শূকর	শূকরী	হিতকর	হিতকরী
শৃগাল	শৃগালী	পিতামহ	পিতামহী

(ঙ) অনেক শব্দের শেষে 'আনী'/'আনি' প্রত্যয় যোগ করেও স্ত্রীলিঙ্গ করা যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
চাকর	চাকরানি	নাপিত	নাপিতানি
চৌধুরি	চৌধুরানি	ঠাকুর	ঠাকুরানি
বরুণ	বরুণানী	ভব	ভবানী
রুদ্র	রুদ্রাণী	শিব	শিবানী
শর্ব	শর্বাণী	ব্রহ্ম	ব্রহ্মাণী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মহেন্দ্র	মহেন্দ্রাণী	আচার্য	আচার্যাণী
মাতুল	মাতুলানি	শূদ্র	শূদ্রানী

(চ) অনেক শব্দের শেষে 'ইনী'/'ইনি' প্রত্যয় যোগ করেও স্ত্রীলিঙ্গ করা যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বিদেশি	বিদেশিনি	তপস্বী	তপস্বিনী
গোয়ালা	গোয়ালিনি	অভাগা	অভাগিনি
কাঙাল	কাঙালিনি	রোগী	রোগিনী
বাঘ	বাঘিনি	গৃহী	গৃহিণী
মায়াবী	মায়াবিনী	অভিমানী	অভিমানিনী
হরিণ	হরিণী	ভোগী	ভোগিনী
ধনী	ধনিনী	হস্তী	হস্তিনী
নাগ	নাগিনি		

(ছ) শব্দের আগে বা পরে স্ত্রীলোক-বাচক শব্দ যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ করা যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ডাক্তার	ডাক্তারগিন্নি	পুলিশ	মেয়ে পুলিশ
হুলো বিড়াল	মেনি বিড়াল	মৌমাছি	স্ত্রী মৌমাছি
এঁড়ে বাছুর	বকনা বাছুর	বোলতা	স্ত্রী বোলতা
শিশুপুত্র	শিশু কন্যা	বামুন	বামুনগিন্নি
লোক	স্ত্রীলোক	পুরুষ মানুষ	মেয়ে মানুষ
গোঁসাই	মা গোঁসাই	হাতি	মাদি হাতি
বসু	বসুজায়া	কবি	মহিলা কবি
বেনে	বেনেবউ	ঠাকুরপো	ঠাকুরঝি

(জ) শব্দের শেষে 'নি' প্রত্যয় যোগকরে স্ত্রীলিঙ্গ করা যায় :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
জেলে	জেলেনি	মেছো	মেছনি
মাস্টার	মাস্টারনি	নাতি	নাতনি
ভিখারি	ভিখারিনি	চোর	চোরনি
বেদে	বেদেনি		

(ঋ) অৎ-ভাগান্ত, অয়স-ভাগান্ত, ইন-ভাগান্ত ও বিন-ভাগান্ত শব্দগুলির ঈ-প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হয় :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বলবান	বলবতী	পক্ষী	পক্ষিনী
রূপবান	রূপবতী	হস্তী	হস্তিনী
শ্রীমান	শ্রীমতী	দুঃখী	দুঃখিনী
গুণবান	গুণবতী	যোগী	যোগিনী
বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী	মানী	মানিনী
মহৎ	মহতী	হিতৈষী	হিতৈষিনী
প্রেয়স	প্রেয়সী	মায়াবী	মায়াবিনী
শ্রেয়স	শ্রেয়সী	তপস্বী	তপস্বিনী
গরীয়ান	গরিয়সী	যশস্বী	যশস্বিনী
মহীয়ান	মহীয়সী	পয়স্বী	পয়স্বিনী

(ঞ) ঋ-কারান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-প্রত্যয় হয় :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দাতা	দাত্রী	নিয়ন্তৃ	নিয়ন্ত্রী
কর্তা	কর্ত্রী	শিক্ষয়িতৃ	শিক্ষয়িত্রী
নেতা	নেত্রী	রচয়িতৃ	রচয়িত্রী
বিধাতা	বিধাত্রী	অভিনেতৃ	অভিনেত্রী

(ট) দৃশ্-ভাগান্ত ও ইক-ভাগান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-প্রত্যয় হয় :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
যদৃশ	যদৃশী	বার্ষিক	বার্ষিকী
তাদৃশ	তাদৃশী	পাক্ষিক	পাক্ষিকী
সদৃশ	সদৃশী	সাপ্তাহিক	সাপ্তাহিকী
ভবাদৃশ	ভবাদৃশী	আধুনিক	আধুনিকী

(ঠ) অঙ্গের অধিকারী অর্থে কিছু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আ ও ঈ-দুই প্রত্যয় হয় :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সুকেশ	সুকেশা/সুকেশী	চন্দ্রমুখ	চন্দ্রমুখা/চন্দ্রমুখী
কৃশোদর	কৃশোদরা/কৃশোদরী	লম্বোদর	লম্বোদরা/লম্বোদরী
বিম্বোষ্ঠ	বিম্বোষ্ঠা/বিম্বোষ্ঠী	শূর্পনখ	শূর্পনখা/শূর্পনখী

(ঙ) কিন্তু নেত্র, নয়ন, ভুজ প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে কিন্তু 'ঈ' প্রত্যয় হয়। যেমন—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ত্রিনেত্র	ত্রিনেত্রা	ত্রিনয়ন	ত্রিনয়না
মৃগনয়ন	মৃগনয়না	দশভূজ	দশভূজা

(চ) কতকগুলি শব্দের ক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী প্রত্যয় হয়। স্ত্রী প্রত্যয়ের ভিন্নতায় অর্থের পার্থক্য ঘটে।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
আচার্য	আচার্যা/আচার্যানি	শূদ্র	শূদ্রা/শূদ্রাণী
উপাধ্যায়	উপাধ্যায়া/উপাধ্যায়ানি	সূর্য	সূর্যা/সূরী
ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া/ক্ষত্রিয়ী/ক্ষত্রিয়ানী	যবন	যবনানী

খাঁটি বাংলা স্ত্রী প্রত্যয়

(ক) বাংলা শব্দে সাধারণত ঈ, আনী, নী, ইনী প্রত্যয় হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শব্দের কোনো লোপ বা পরিবর্তন ঘটে। যেমন—'ঈ' প্রত্যয় যোগে

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
খুড়া	খুড়ী	ঝগড়াটে	ঝগরাটী	মোরগ	মুরগী
জেঠা	জেঠী	সোহাগ	সোহাগী	পাঁঠা	পাঁঠী
দাদু	দাদী	বাড়িওয়ালা	বাড়িওয়ালী	ভেড়া	ভেড়ী
চাচা	চাচী	কাকা	কাকী	হিংসুটে	হিংসুটী
মামা	মামী	খোকা	খুকী	অভাগা	অভাগী
শালা	শালী	ছোঁড়া	ছুঁড়ী	ন্যাকা	নেকী
শাহাজাদা	শাহাজাদী	বুড়া	বুড়ী	দুধওয়ালা	দুধওয়ালী
বামন	বামনী	বেটা	বেটি	বোষ্টম	বোষ্টমী
পাঠান	পাঠানী	মদ্দা	মাদী	কৃষাণ	কৃষাণী
বান্দা	বাঁদী	আদুরে	আদুরী	বাঁদর	বাঁদরী

(খ) 'আনী' প্রত্যয় যোগে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নাপিত	নাপিতানী	রাজপুত	রাজপুতানী	ঠাকুর	ঠাকুরানী
চাকর	চাকরানী	মেথর	মেথরানী	পণ্ডিত	পণ্ডিতানী

(গ) 'ইনি' প্রত্যয় যোগে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাঘ	বাঘিনী	গোয়ালা	গোয়ালিনী	পাগল	পাগলিনী
কাঙালী	কাঙালিনী	সাপ	সাপিনী	চাতক	চাতকিনী
উন্মাদ	উন্মাদিনী	রজক	রজকিনী		

(ঘ) 'নী' প্রত্যয় যোগে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ধোপা	ধোপানী	জেলে	জেলেনী	ডোম	ডোমিনী
তেলী	তেলেনী	কামার	কামারিনী	জমিদার	জমিদারনী
ডাক্তার	ডাক্তারনী	মাস্টার	মাস্টারনী		

(ঙ) পুরুষবাচক বা স্ত্রীবাচক শব্দ যোগে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পুরুষমানুষ	মেয়েমানুষ	গোঁসাই	মাগোঁসাই	কর্মী	মহিলাকর্মী
বেটাছেলে	মেয়েছেলে	কবি	মহিলা কবি	হাতী	মাদি হাতী
ঠাকুরপো	ঠাকুরঝি	প্রতিনিধি	মহিলা প্রতিনিধি	জমিদার	জমিদার গিন্নী
বীর বাঁদর	মেনী বাঁদর	পুত্রসন্তান	কন্যাসন্তান	গয়লা	গয়লাবউ
উঁট	মাদী উঁট	পুরুষ যাত্রী	মহিলা যাত্রী	হুলো বেড়াল	মেনী বেড়াল
এঁড়ে বাছুর	বকনা বাছুর				

(চ) ভিন্ন শব্দ যোগে : (তৎসম শব্দ যোগে)

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পতি	পত্নী/জায়া	গো	গাভী	ভ্রাতা	ভগিনী
পুরুষ	স্ত্রী/প্রকৃতি	কর্তা	গৃহিনী	রাজা	রাজ্ঞী
নর	নারী	পুত্র	কন্যা/পুত্রবধূ	জনক	জননী
পিতা	মাতা	স্বামী	স্ত্রী	বন্ধু	বান্ধবী
শ্বশুর	শ্বশ্রূ	বর	কনে/বধূ	গোপ	গোপী
সম্রাট	সম্রাজ্ঞী				

(ছ) বাংলা দেশী শব্দের ক্ষেত্রে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাবা	মা	বেয়াই	বেয়ান	চাকর	ঝি
দাদা	দিদি/বৌদি	জামাই	মেয়ে/ঝি	শালা	শালাজ
ছেলে	মেয়ে/বউ	কর্তা	গিন্নী	ঠাকুরদা	ঠাকুরমা
ভাই	বোন	ভাগনে	ভাগনী	তালুই	সাউই
ভাশুর	জা	দাদামশাই	দিদিমা	নন্দাই	ননদ
ভূত	পেত্নী	শুক	সারী	বর	কনে
শ্বশুর	শাশুড়ী	পিসে	পিসি	মেসো	মাসি

(জ) বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সাহেব	বিবি/মেম	ফুপা	ফুপু	বাদশা/নবাব	বেগম
খালু	খালা	গোলাম/নফর	বাঁদী	আব্বা	আম্মা
খানসামা	আয়া	জনাব	খাতুন	লর্ড	লেডী
মিস্টার	মিসেস	মাস্টার	মিস্	গোরা	মেম

(ঝ) কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দের সংস্কৃত নিয়মে একরূপ এবং প্রচলিত বাংলায় বা চলিত নিয়মে অন্য রূপ:

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
শ্বশুর	শ্বশ্রূ (সংস্কৃত নিয়মে)/ শাশুড়ী (চলিত নিয়মে)		
গোপ	গোপা/গোপিনী	রজক	রজকী/রজকিনী
অনাথ	অনাথা/অনাথিনী	রাজা	রাজ্ঞী/রানী
চাতক	চাতকী/চাতকিনী	শ্যামল	শ্যামলা/শ্যামলী
ধবল	ধবলা/ধবলী		

(ঞ) কতকগুলি শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ—

বাঁজা, ধনি, সতিন, রূপসি, সজনি, ধাই, এয়ো, বিধবা, সধবা, তারকা, ললনা, বিমাতা, অঙ্গনা।

(ট) কতকগুলি শব্দ নিত্য পুংলিঙ্গ—

কৃতদার, মৃতদার, বিপত্নীক, স্ত্রৈন্য, কবিরাজ, কাপুরুষ, দারোগা, পুরোহিত, কুস্তিগীর।

অনুশীলনী

১। 'আ' প্রত্যয় যোগে লিঙ্গ পরিবর্তন করো :

আত্মজ, সদস্য, আধুনিক, প্রথম, চপল, শ্রদ্ধেয়, কৃশ, অনাথ, কোমল, মুখর, সহোদর, শূদ্র, তৃতীয়, পূজনীয়।

২। 'ঈ'/'ই' প্রত্যয় যোগে লিঙ্গান্তর করো :

ব্রাহ্মণ, কিশোর, তাপস, সুন্দর, পাগল, মৃগ, ছাগ, শৃগাল, তরুণ, কুমার, হংস, ছাত্র, দাম।

৩। 'ইকা' যোগে লিঙ্গান্তর করো :

পাচক, নাটক, সহায়ক, বাহক, গ্রাহক, পাঠক, সাধক, সম্পাদক, পালক, পরিচালক, লেখক, নায়ক, শিক্ষক, সাধক, নির্দেশক।

৪। 'আনী'/'আনি' বা 'নি' যোগে লিঙ্গান্তর করো :

ব্রহ্মা, রুদ্র, জেলে, কামার, মেছো, ভিখারি, কাঙাল, গয়লা, শিব, ডাক, মেথর, চোর, নাপিত, ধোপা, সর্ব।

৫। লিঙ্গান্তর করো :

রাগ, বিধবা, কুমারী, কনে, মৎস্য, মোরগ, সর্দার, অসহায়, ছাগল, রজক, গায়ক, কবি, রাজ্ঞী, যুবতী।

বচন

বাক্যস্থিত কোনো পদ যা কোনো ব্যক্তি, প্রাণী, বস্তু প্রভৃতিকে বোঝাচ্ছে তারা সংখ্যায় এক না একাধিক এই ব্যাপারটি বোঝানোর বিষয়টিকে বলা হয় বচন।

বাংলা বচন দু-প্রকার : (i) **একবচন** ও (ii) **বহুবচন**। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় বচন তিন প্রকার—(i) **একবচন**, (ii) **দ্বিবচন** ও (iii) বহুবচন।

একবচন : যে পদের দ্বারা একমাত্র ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানো হয় তাকে একবচন বলে। যেমন—আকাশ, বই, মামা, ছাত্র, বালক, গাছ, পাখি প্রভৃতি।

বহুবচন : যে পদের দ্বারা একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানো হয় তাকে বহুবচন বলে। যেমন—বইগুলি, ছেলের দল, পতঙ্গের পাল প্রভৃতি।

একবচনের চিহ্ন : টি, টা, খানি, খানা।

বহুবচনের চিহ্ন : গুলি, গুলো, সব, রা, গণ, পুঞ্জ, দল, মালা, পাল।

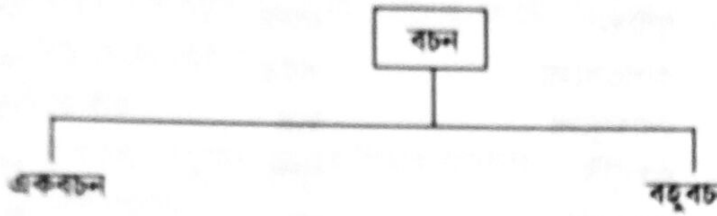

গাছটি, কাপড়খানা, লোকটা, বইখানি প্রভৃতি। বইগুলি, কাপড়গুলো, শিক্ষকগণ, বন্যেরা প্রভৃতি।

একবচন থেকে বহুবচন করার নিয়মগুলি হল

(i) প্রাণীবাচক শব্দে রা, এরা, দিগ প্রভৃতি বহুবচনের চিহ্ন যোগ করে—যারা, তারা, বন্দিরা, মেঘেরা, তোমরা, আমরা, ছেলেমেয়েদের প্রভৃতি।

(ii) বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পূর্বে 'বিস্তর', 'অজস্র', 'অসংখ্য', 'কত', 'যত', 'তত' প্রভৃতি বহুবচনাত্মক বিশেষণ; দুই, তিন, সাত প্রভৃতি সংখ্যাবাচক বিশেষণ; সব, সকল, অনেক প্রভৃতি সর্বনামীয় বিশেষণ বসিয়ে—অজস্র লিচু, অত কথা, এত খাবার, পাঁচশো লোক, তিনশো টাকা, অনেক মন্ত্রী, সব টাকা প্রভৃতি।

(iii) প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক শব্দের পরে গুলো, গুলি, গুলা প্রভৃতি শব্দ বসিয়ে—কামানের গোলাগুলি, বছরগুলো, দিনগুলি মোর, বইগুলো প্রভৃতি।

(iv) প্রাণীবাচক তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের শেষে গণ, কুল, জন, দল, বর্গ, বৃন্দ, মহল, মণ্ডলী প্রভৃতি শব্দ বসিয়ে—মহিলামহল, মুনিগণ, শিষ্যবৃন্দ, শ্রোতৃবর্গ, শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রদল, কৃষককুল, গুণীজন প্রভৃতি।

(v) অপ্রাণীবাচক তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের শেষে রাশি, সমূহ, মণ্ডল, পুঞ্জ, মালা, শ্রেণি, রাজি, আবলী, ময়, জাল, সমুদয়, কুল, দাম প্রভৃতি যোগ করে—খইয়ের রাশি, তরুশ্রেণি, পর্বতমালা, মেঘপুঞ্জ, পুষ্পরাশি, শরজাল, বিটপীকুল, পত্রসমূহ, দীপাবলী, বিদ্যুদ্দাম, গিরিশ্রেণি, কেশদাম প্রভৃতি।

(vi) সমার্থক বা প্রায় সমার্থক শব্দ যোগে একবচন থেকে বহুবচনে রূপান্তরিত করা যায়—জিনিসপত্র, চিঠিপত্র, ছেলেপিলে, ভাবনাচিন্তা, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি।

(vii) বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগ করেও বহুবচন করা যায়—রাশিরাশি, বড়োবড়ো, ছোটোছোটো, এক একদিন, বাছাবাছা প্রভৃতি।

(ix) সর্বনাম পদের দ্বিত্ব প্রয়োগ করে—কে কে, কেউ কেউ, যে যে প্রভৃতি।

(x) সংখ্যাবাচক পদের দু-বার প্রয়োগ করে—লক্ষ লক্ষ টাকা, সাত সতেরো চিন্তা, হাজার হাজার লোক, শত শত বছর, শত শত গ্রাম প্রভৃতি।

(xi) কোনো কোনো বিশেষ্য নিজেরাই বহুবচন—চালের গোদাম, ফুলের বাগান, তারার শোভা, সমুদ্রের ঢেউ প্রভৃতি।

বিশেষ্য পদের একবচন ও বহুবচনের কিছু রূপ

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
বালক	বালকগণ	শিক্ষক	শিক্ষকবৃন্দ
ছাত্র	ছাত্রবৃন্দ	শিক্ষিকা	শিক্ষিকাবৃন্দ
মানুষ	মানুষগুলো	দিন	দিনগুলি
মা	মায়েরা	মেয়ে	মেয়েরা
লোক	লোকেরা	জাতি	জাতি সমূহ
গুণী	গুণীজন	নক্ষত্র	নক্ষত্ররাজি
কাপড়খানা	কাপড়গুলো	পর্বত	পর্বতমালা/পর্বতশ্রেণি
লোকটা	লোকগুলো	ছাত্র	ছাত্রেরা/ছাত্রগণ
গাছটি	গাছগুলি	পুষ্প	পুষ্পরাজি
পুস্তকখানি	পুস্তকগুলি	পত্র	পত্র সমূহ

সর্বনাম পদের একবচন ও বহুবচনের কিছু রূপ

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
আমি	আমরা	তাকে	তাদেরকে
সে	তারা	তোমার	তোমাদের
তুমি	তোমরা	আপনার	আপনাদের
তিনি	তাঁরা	কার	কাদের
আমাকে	আমাদিগকে	যিনি	যাঁরা
ওর	ওদের	ওকে	ওদেরকে
এর	এদের	এ	এরা
যাকে	যাদেরকে	একে	এদেরকে
তোর	তোদের	যার	যাদের
তুই	তোরা	আমার	আমাদের
আপনাকে	আপনাদিগকে	ইনি	এঁদের
যে	যারা	উনি	ওঁদের
তাহাকে	তাহাদিগকে	তিনি	তাঁদের
তোমাকে	তোমাদিগকে	ও	ওরা

অনেক সময় সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের বহুবচন হয়। যেমন—

মিরজাফরদের মৃত্যু নেই। ঘরভেদী **বিভীষণদের** বিশ্বাস কোরো না। গ্রামের **চৌধুরিরাই** ধনী। **নিরঞ্জনবাবুরা** একথা বলেছেন।

অনুশিলনী

১। **নীচের পদগুলি বচন অনুযায়ী সাজাও :**
উঁচু পাহাড়, ছোটো মাছ, বিশাল বিশাল নদী, যে যে লোক, বেতগাছা, রাজারাজড়া, গ্রন্থরাজি, যানবাহন, ভদ্রমণ্ডলী, নেতৃবর্গ, বালকবৃন্দ, পাঠক গোষ্ঠী, গ্রামখানা, বইটা, শিক্ষকগণ, মেঘমালা, সৈন্যবাহিনী, বালকেরা, আমার।

২। **নীচের শব্দগুলিকে বহুবচনে পরিবর্তিত করো :**
গ্রন্থ, সৈন্য, জীব, পাঠক, মহাপুরুষ, পন্ডিত, শিক্ষক, ছেলে, গাছ, পর্বত, নদী।

৩। **শুদ্ধ করো :**
দেবতাগুলি, শিক্ষকগুলি, ছেলেবৃন্দ, আমসমূহ, বইয়েরা, যে যে ছাত্র, বিশাল বিশাল নদীগুলি, সমস্ত লোকেদের অনেক ছেলে, সমস্ত খেলোয়াড়েরা।

৪। **উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও :**
সর্বনাম পদের দ্বিরুক্তি দিয়ে বহুবচন, শব্দের বিভক্তি প্রয়োগে বহুবচন, বহুত্ববাক্যে পদ দিয়ে বহুবচন, বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তি প্রয়োগে বহুবচন।

৫। —রাজি, —সভা, —বর্গ, —গোষ্ঠী, —শব্দযোগে বহুবচন পদ গঠন করো (তিনটি করে)।

৬। **একবচন না বহুবচন বলো :**

ফুলের বাগান	———
তারার শোভা	———
যে যে	———
রাশি রাশি	———
শরজাল	———
ভাবনা চিন্তা	———
কেশদাম	———
দীপপুঞ্জ	———
বাটিখানা	———
মুকুটখানি	———
বন্যেরা	———

৭। **বচন কাকে বলে? বচন কয়প্রকাশ ও কী কী?**

৮। **একবচনে কী কী ভাবে বহুবচন কার যায়, উদাহরণ সহযোগে লেখো।**